দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭২ বর্ষ, ১ সংখ্যা।। ২৬ আগস্ট ২০১৯।। ৮ ভাদ্র - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

সামায়িকই থাকবে। এখনও পর্যন্ত সংবিধান সংশোধন করে সেরকম কিছু করা হয়নি। সুতরাং ৩৭০ ধারায় বর্ণিত কাশ্মীরের স্পেশাল স্টেটাস তকমা এখনও সাময়িক।
— সুভাষ কাশ্যপ,সংবিধান বিশেষজ্ঞ

৩৭০ ধারা মুক্ত কাশ্মীর

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ৩৭০ ধারা অবশ্যই একটি সাময়িক ব্যবস্থা। যতক্ষণ না সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ব্যবস্থাটিকে স্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয় ততক্ষণ এটি সাময়িকই থাকবে। এখনও পর্যন্ত সংবিধান সংশোধন করে সেরকম কিছু করা হয়নি। সুতরাং ৩৭০ ধারায় বর্ণিত কাশ্মীরের স্পেশাল স্টেটাস তকমা এখনও সাময়িক।
— সুভাষ কাশ্যপ,সংবিধান বিশেষজ্ঞ

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ১ সংখ্যা, ৮ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৬ আগস্ট - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

কমিউনিস্ট দলে ‘মুসলমানত্ব’ স্বীকৃত, ‘হিন্দু’ হওয়াটাই অপরাধ
▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : আমরা সবাই রাজা, দিদির রাজত্বে
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

আমাদেরও সময় আসছে ▯ আর জগন্নাথন ▯ ৮

৩৭০ ধারার অবলুপ্তির মাধ্যমে কাশ্মীরের রাহুমুক্তি ঘটল
▯ পুলক নারায়ণ ধর ▯ ১১

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম ভারত-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ▯ ডা: রবীন্দ্রনারায়ণ দাস ▯ ১৩

পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ পেটানোর সংস্কৃতি অশনি সংকেত বয়ে আনছে ▯ মণীন্দ্রনাথ সারা ▯ ১৫

বাঙ্গালি এখন দুর্বৃত্তের শাসনে বন্দি ▯ বলাই চন্দ্র চক্রবর্তী ▯ ১৭

মোদী-শাহের পরিকল্পনা রূপায়ণের মূল মস্তিষ্ক দোভাল
▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৮

সাফল্য ভারতের বিদেশনীতির, জয় ভারতের কূটনীতির
▯ বিমলশঙ্কর নন্দ ▯ ২৩

যাঁরা করাচীর ভাষায় কথা বলছেন তাঁদেরও জেলবন্দি করা হোক ▯ সুজিত রায় ▯ ২৬

বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপে তার প্রকাশ
▯ চূড়ামণি হাটি ▯ ৩১

গল্প : অভিমানী ▯ সিদ্ধার্থ সিংহ ▯ ৩৫

জাতীয় সঙ্গীতকে যিনি ভালোবাসেন না তিনি কি শিল্পী
▯ শিতাংশু গুহ ▯ ৪২

তৃণমূলের হাত থেকে বাঙ্গলাকে বাঁচানো এখন প্রধান কর্তব্য
▯ নন্দদুলাল চৌধুরী ▯ ৪৩

শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করলেন মোদী
▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯
সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **চিত্রকথা : ৪০** ▯
খেলা : ৪১

প্রকাশিত হবে
২ সেপ্টেম্বর
২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২ সেপ্টেম্বর
২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কাশ্মীর

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় কাশ্মীর। প্রাচীন একটি জনপদ, যা সহিত্যে-ইতিহাসে ভূস্বর্গ নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। সেই কাশ্মীর কীভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বিভীষিকায় পরিণত হলো তার অনুপুঙ্ক্ষ বিবরণ থাকবে আগামী সংখ্যায়। সর্বভারতীয় লেখকদের পাশাপাশি কলম ধরবেন এই বঙ্গের লেখকরাও।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank - Kolkata
Branch : **Shakespeare Sarani**

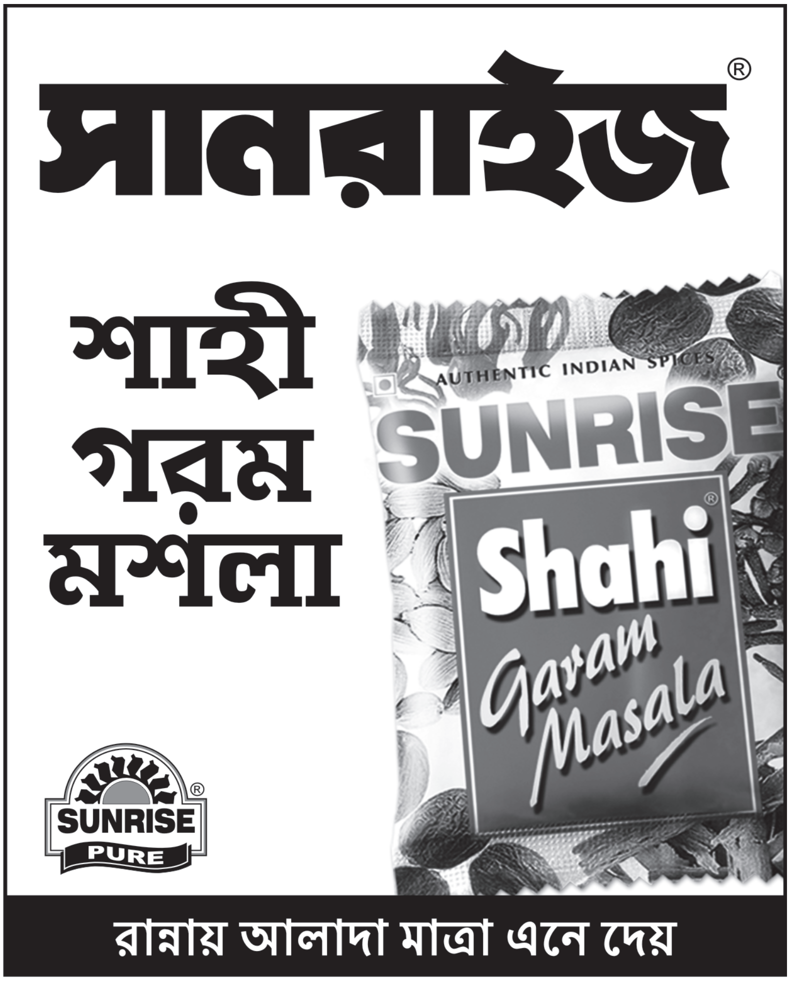

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের বিরোধিতা কার স্বার্থে

জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহৃত করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে বিগত সত্তর বৎসরে ইতিপূর্বে কোনো প্রধানমন্ত্রী যে সাহস প্রদর্শন করেন নাই, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করিয়া সেই সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন। দেশবাসীর সম্মুখে তিনি একটি সুস্পষ্ট বার্তা দিয়াছেন। বার্তাটি এই যে, ৩৭০ ধারার অন্তরালে কাশ্মীরে কোনোরূপ বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপকে তিনি অন্তত প্রশ্রয় দিবেন না। বরং কাশ্মীর এবং কাশ্মীরের জনগণকে মূল স্রোতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টাই এইবার হইবে। কাশ্মীর হইতে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহৃত হইবার পর, স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসীর শুভেচ্ছায় প্লাবিত হইয়াছেন নরেন্দ্র মোদী। শুধু দেশবাসী নয়, বিদেশি রাষ্ট্রগুলিও প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাইয়াছে। দুই হাত তুলিয়া প্রধানমন্ত্রীকে আশীর্বাদ করিতেছে জম্মু ও লাদাখের অধিবাসীরা। মনে রাখিতে হইবে, জওহরলাল নেহরুর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে জম্মু ও লাদাখের অধিবাসীবৃন্দের মতামতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াই শেখ আবদুল্লাহকে তুষ্ট করিবার জন্য কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্তকে দেশবাসী সমর্থন করিলেও, দেশেরই ভিতরে কতিপয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ইহার বিরোধিতা করিতেছে। এই বিরোধীদের দলে রহিয়াছেন ফারুক আবদুল্লাহ, ওমর আবদুল্লাহ, মেহবুবা মুফতির মতো কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতারা, রহিয়াছে কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা, রহিয়াছে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি এবং অবশ্যই ভারতের চিরকালীন শত্রুরাষ্ট্র পাকিস্তান। কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাকিস্তান যাহা বলিতেছে ফারুক আবদুল্লা, ওমর আবদুল্লাহ, মেহবুবা মুফতি, বামপন্থী, কংগ্রেসি ইহারা সেই একই সুরে কথা বলিতেছেন। প্রশ্ন হইল, কাশ্মীর লইয়া পাকিস্তানের এত শিরঃপীড়া কেন? কাশ্মীর ভারত রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা থাকিবে, কী থাকিবে না— তাহা ভারতই একমাত্র ঠিক করিবে, অন্য কেহ নয়। পাকিস্তানের সমস্যাটি অন্যত্র। পাকিস্তান বুঝিতে পারিয়াছে, ৩৭০ ধারা প্রত্যাহৃত হইলে কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন অচিরেই বিনাশ হইবে। সেই ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মাধ্যমে যে ছায়াযুদ্ধ এতদিন যাবৎ চালাইয়া অসিতেছিল পাকিস্তান—তাহাও বিফলে যাইবে। তাই পাকিস্তানের এত গাত্রদাহ। কিন্তু হইলে হইবে কী—আন্তর্জাতিক দুনিয়াতেও পাকিস্তানের পক্ষে কেহই কথা বলিতেছে না।

কিন্তু দেশের ভিতরে যাহারা পাকিস্তানের মতোই ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের বিরোধিতা করিতেছেন, তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, পাকিস্তানের সহিত ইহাদের উদ্দেশ্যের খুব একটা ফারাক নাই। ৩৭০ ধারার অন্তরালে কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কার্যকলাপ অক্ষুণ্ণ থাকুক—ইহাই এই বিরোধীদের কাম্য। বিরোধীদের কার্যকলাপই প্রকাশ করিতেছে, তাহারা কার্যত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির পক্ষেই সওয়াল করিতেছে। ঘটনা পরম্পরা বিচার করিলে দেখা যায়, ৩৭০ ধারা কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে পুষ্ট করিয়াছে। কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের জন্ম দিয়াছে। শেখ আবদুল্লাহ কখনই মানসিকভাবে ভারতীয় ছিলেন না। ভারত রাষ্ট্রের ভিতর অবস্থান করিয়াও তিনি কাশ্মীরকে একটি স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৩৭০ ধারা তাহার হস্তে সেই অস্ত্রের জোগান দিয়াছিল। ফারুক আবদুল্লাহর শাসনকালে ৭০ জন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গিকে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। এবং ইহার পরই ১৯৯০ সালে কাশ্মীর হইতে হিন্দু পণ্ডিতদের বিতাড়ন করা হয়। নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় কাশ্মীরি পণ্ডিতদের। সাত-সাতটি গণহত্যার শিকার হইয়াছিল কাশ্মীরি পণ্ডিতরা। যাহারা আজ ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের বিরোধিতা করিতেছেন, তাহারা কিন্তু তখন নীরব ছিলেন।

কাশ্মীরে সেই হিংসার রাজনীতি বন্ধেই নরেন্দ্র মোদী ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করিয়াছেন। দেশবাসী ইহা বুঝিয়াছেন। বুঝিতেছে না শুধু তাহারা, যাহারা বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থক।

সুভাষিতম্

জ্ঞাননেত্রং সমাদায় চরেৎ বুদ্ধিমতঃ পরম।

নিষ্কলং নির্মলং শান্তং তৎ ব্রহ্মোঽহমিতি স্মৃতম্।। (উপনিষদ)

জ্ঞাননেত্র খোলা রেখে বুদ্ধিমান ব্যক্তি জগতে চলাফেরা করেন। মনে মনে তিনি এই স্মৃতিটি জাগিয়ে রাখেন যে, যিনি নিষ্কল, নির্মল, শান্ত ব্রহ্মপুরুষ, তিনিই হলেন 'আমি'।

কমিউনিস্ট দলে ‘মুসলমানত্ব’ স্বীকৃত, ‘হিন্দু’ হওয়াটাই অপরাধের

মহম্মদ সেলিম, বিশিষ্ট সিপিএম নেতা, এক গুরুতর অভিযোগে সাইবার সেলের দারস্থ হয়েছেন। অভিযোগটা এমনই কয়েকবছর আগে তিনি যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন সেখানকার একটি কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন পরিবারে গিয়ে ওঠেন। পরিবারটি যেহেতু ‘কমিউনিস্ট’ তাই সেলিম সাহেবের পাতে নাকি প্রতিদিনই গো-মাংসের টুকরো পড়ছিল। কিন্তু গোল বাঁধে সেলিমের মার্কিন প্রবাসের শেষ দিনে। অভিযোগ অনুযায়ী ওইদিন সেলিমের পাশাপাশি আরও জনাকয়েক অতিথি আমন্ত্রিত ছিল এবং মেনুতে গোমাংসের সঙ্গে শুয়োরের মাংসও ছিল। এতেই নাকি বিস্তর চটে যান সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্যটি ও টেবিল উল্টে ফেলে দেন। শেষে নাকি জনৈক ‘মুসলমান’-এর বাড়িতে গিয়ে নৈশাহার সারেন।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এহেন খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় চাউর হয়ে যায় এবং একটি ই-ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন অনুযায়ী এমন খবরে বেজায় চটে মহম্মদ সেলিম কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলের দারস্থ হয়েছেন। ওই ওয়েব ম্যাগাজিনের খবর এও বলছে এই রটনাটি আমেরিকা থেকে হলেও হতে পারে। কারণ সেলিমের এই আচরণে কমিউনিস্ট পরিবারটি বেশ ক্ষুব্ধ হন, এরপর কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ সম্পর্কে তাঁদের মোহভঙ্গ হয়, তাঁরা হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের অনুরাগী হয়ে উঠে তাঁদের দান-ধ্যান করেন ইত্যাদি। সত্যি কথা বলতে কী, সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন অনেক কিছুই শোনা যায়, যার বাস্তবিক ভিত্তি থাকে না।

মহম্মদ সেলিমের ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটেছে কিনা আমাদের জানা নেই। প্রমাণের অভাবে এক্ষেত্রে সেলিম যে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছেন, তেমনটাও যেমন বলা যায় না, আবার সত্যিই এমন ঘটেছে কিনা তাও বলা মুশকিল। কিন্তু সাম্প্রতিক প্রবণতা কিছু প্রশ্নের জন্ম দিতে বাধ্য করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু খাওয়া-দাওয়া সংক্রান্ত গ্রুপ আছে। যাদের একটি সবে গজিয়ে ওঠা এবং আরেকটি একই গোত্রের জনপ্রিয় গ্রুপের নাম চুরি করে তৈরি হয়েছে। এই ধরনের গ্রুপে অবাধে গো-মাংস রন্ধনের ছবি প্রকাশিত হয়, বলা বাহুল্য খাদ্যরসিকতা বা উৎকৃষ্টতার দিকে কোনো লক্ষ্য তাতে থাকে না, এসব ‘পোস্ট’ মূলত উস্কানিমূলক। এক দলবদলু তথাকথিত কবি আর ভোটে হেরো আইনজীবী দুই বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে অবস্থান করেও মুসলমান প্রধান অঞ্চলে গো-মাংস খেয়ে বীরত্ব দেখিয়েছিল। উল্টো দিকে হিন্দুরা গোরুর দুধ বিলি করেছিলেন ধর্মতলার মোড়ে। একইভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দু-নামধারী ও মুসলমানদের গো-মাংস প্রদর্শনের ছবি দেখেও শুয়োরের মাংস পাল্টা প্রদর্শিত হয় না। সুতরাং কোন জনগোষ্ঠী শান্তিপ্রিয় সেটা বোঝা যায়। গো-মাংসভোজী এই ‘হিন্দু নামধারী’দের সঙ্গে প্রকৃত ‘হিন্দু’দের কোনও সম্পর্ক নেই। এরা একটি বিশেষ জাত, যাদের কমিউনিস্ট বা দেশদ্রোহী, যাই বলুন না কেন এদের মূল লক্ষ্য সাম্প্রদায়িক উস্কানি, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও পাক-লবির দালালি।

একদা প্রকাশ কারাটের ব্লু আইড বয় নিজের ব্যক্তিগত ধান্দায় দেউলিয়া কমিউনিস্ট পার্টি থেকে আর কিছু পাবার আশা নেই বুঝে সরে গিয়েছিল, যাবার আগে বলে গিয়েছিল মুসলমান কোটায় মহম্মদ সেলিম পলিটব্যুরো সদস্য হয়েছে। নন্দীগ্রাম পর্বে রাজাবাজারে দাঁড়িয়ে সেলিমের উস্কানিমূলক মন্তব্য যার নিন্দে-মন্দ হয় তৎকালীন তারা টিভিতে, আর ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা এই ব্যক্তিটিকে চেনেন তাঁরা সকলেই বলেন এনার কমিউনিজমের মধ্যে মুসলমানত্ব এমনই নাকি প্রবল যে নিজের কমপ্লেক্সের দুর্গাপুজোয় মুখও দেখান না। আসলে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ১৯২০ সালে তাসখন্দে মানবেন্দ্রনাথ রায় যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে ভারতীয়ত্বের ছোপ বিশেষ লাগেনি কারণ মানবেন্দ্রনাথ সহায়তা পেয়েছিলেন জেহাদের জন্য সেখানে যাওয়া একদল মুসলমানের যারা আসলে তাসখন্দে আটকে পড়েছিল এবং ওখান থেকে বেরোনোর জন্য কমিউনিস্ট পরিচয় তাদের খুবই দরকার ছিল।

এরাই মানবেন্দ্রনাথ রায়কে সুকৌশলে ব্যবহার করে। এবং যে কমিউনিস্ট পার্টিটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে ‘ভারতীয়’ শব্দটি ছিল না, কিন্তু লোকগুলো ভারতের বোঝাতে ‘কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া’র জন্ম হয়। এ জি নুরানি সাহেবের আর এস এস-ফ্যাসিস্ট সংযোগের মিথ্যাচার আর গাল গল্প তো অনেক চলল। এবার কমিউনিস্ট-জেহাদি সংযোগের প্রকৃত তথ্য সামনে এলে পাকিস্তান দাবির সমর্থনে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতায় কমিউনিস্ট পার্টি আর মুসলিম লিগের সৌহার্দ্যের ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যাবে। তাই একটা স্পষ্ট কথা আজ সকলের বোঝা উচিত, সেলিমের বিষয়টি সত্য হোক বা না হোক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ‘মুসলমান’ হয়ে থাকা চলে, কিন্তু ‘হিন্দু’ হওয়া এই দলে গর্হিত অপরাধ হিসেবেই গণ্য হয়। এদের ‘দেশদ্রোহিতা’র কারণটাও এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।■

বিশ্বামিত্র-র কলম

এই সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা ৭২তম বর্ষে পদার্পণ করল। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর শুভলগ্নে স্বস্তিকা-র লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

— **স্বস্তিকা, সম্পাদক**

আমরা সবাই রাজা, দিদির রাজত্বে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

দিদি,

আপনাকে সেলাম। আপনি যেভাবে নিজের লোকেদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনের কথা বলছেন, তা দেখে সত্যিই সেলাম জানানো ছাড়া কোনো উপায় নেই। আপনাকে প্রশান্ত কিশোর ভাই এই পরামর্শ দিয়েছেন কিনা তা কে জানে! নিজের লোকেদের চুরি ধরার এই যে খেলা আপনি শুরু করেছেন, তা দেখে বিরোধীরা কী বলবে কে জানে, কিন্তু আমি সেলাম জানিয়ে যাব। সেই সঙ্গে এটাও সকলকে বলে দেব, দিদির রাজত্বে যাঁরা নিজেদের রাজা ভাবছেন, তাঁরা সাবধান। কারণ, দিদির রাজত্বে আসলে দিদিই রাজা। নিয়ম-অনিয়ম যা যা করার শুধু তাঁরই অধিকার।

এত কথা কেন বলছি, তার প্রেক্ষাপটটা আগে জানিয়ে দেওয়া দরকার। সম্প্রতি আপনি জানিয়েছেন, রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগ হচ্ছে, অথচ অর্থ দফতর নাকি কিছু জানতেই পারছে না। বিশেষ করে রাজ্যের পুরসভাগুলিতে এই প্রবণতা বেশি হচ্ছে বলে হাওড়ার প্রশাসনিক বৈঠকে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকে বলছেন গোটাটা সাজানো নাটক। কিন্তু আমি তা মানি না। হাওড়া শরৎ সদনে হাওড়ার প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে আপনি বলেন, 'কলেজগুলো আর পুরসভাগুলো লোক নিয়ে নিচ্ছে। আর সেগুলো আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ছে।' সরকারি আধিকারিক থেকে জনপ্রতিনিধি— সকলের উদ্দেশে আপনি বলেন, 'দুমদাম করে লোক নেবেন না। একটা লোক নিয়োগ করতে গেলেও অর্থ দফতরের অনুমোদন লাগে। আমি যে কোনো কাজ করলে অর্থ দফতরের অনুমোদন নিই।' (কেউ হাসবেন না প্লিজ)।

এর পরে আপনি মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'এরপর এসব করলে কোর্ট-কেস-কাছারি হবে।'

প্রশাসনিক বৈঠকের মাঝেই পুরমন্ত্রীর উদ্দেশে আপনি বলেন, 'ববি, এরা অনুমতি নিয়েছিল?' উত্তরে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'দিদি, এঁদের কশান লেটার (সতর্ক করে চিঠি) দেওয়া হয়েছে।' পাল্টা মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কশান লেটার দিলেও তো শুনছে না। এবার অ্যাকশন নাও। চেয়ারম্যান হলে, কাউন্সিলর হলে যা ইচ্ছে তাই করা যায় না।'

হাওড়ার প্রাক্তন মেয়র রথীন চক্রবর্তীকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন আপনি। বলেন, 'তোমরা যাওয়ার আগে ৪০০ লোক নিয়ে নিলে। তারা আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। আমার বাড়ি চলে যাচ্ছে। তোমরাই পাঠাচ্ছ।' মাস দুয়েক আগেই এই অস্থায়ী কর্মীদের তুমুল বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল হাওড়া কর্পোরেশন। দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও হয়ে থাকতে হয়েছিল কমিশনার বিজিন কৃষ্ণণকে। রথীনবাবুকে আপনি সেই কথা মনে করিয়ে বলেন, 'লোক নিয়েছ আর অনুমতি নাওনি কেন? এটা বেআইনি। এঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেলছ।' জবাবে রথীনবাবু বলেন, 'দিদি আপনিই তো ভারবালি (মৌখিক ভাবে) বলেছিলেন।' এই কথা শুনেই রেগে যান আপনি। ধমক দিয়ে বলেন, 'সরকারের কাজে ওসব ভারবাল টার্বাল বলে কিছু হয় না। ডোন্ট ইউজ মাই নেম। এসব বলবে না।'

এখানটায় একটু প্রশ্ন আছে দিদি। আপনি কি সত্যিই কোনো কিছু ভার্বালি বলেন না! আমি তো দেখেছি রাস্তায় দাঁড়িয়ে, হাঁটতে হাঁটতে, আঁকতে আঁকতে আপনি কত কত প্রকল্পের ঘোষণা করে দেন। কত নিয়োগ, কত বরাদ্দ স্রেফ মুখে বলে দেন। তারপর সেটা করা হয়। অন্তত বিজ্ঞপ্তি বের হয়। সেগুলো কী সব অর্থমন্ত্রকের অনুমতি নিয়ে?

সরি সরি সরি। এসব প্রশ্ন আমি কাকে করছি! মুখ্যমন্ত্রী আর বাকিরা কী এক হলো নাকি! তিনিই তো দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সিভিক পুলিশ থেকে সিভিক শিক্ষক সব কিছুই আপনি চাইলে করবেন, না চাইলে করবেন না। এ তো আপনার রাজত্ব। আপনার ভাইয়েরা সেটা না বুঝে ভেবে নিয়েছে, আমরা সবাই রাজা। সেটা হয় নাকি!

রাজা একজনই হয়।

— সুন্দর মৌলিক

আমাদেরও সময় আসছে

অতিথি কলম

আর জগন্নাথন

চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিসংখ্যানগুলির তুলনায় ভারতের অগ্রগতি খরগোস ও কচ্ছপের দৌড়ের মতো মনে হতে পারে। কিন্তু মাত্র ১০ বছরের ব্যবধানে অর্থাৎ ২০৩০ থেকেই সংখ্যাগুলির বদলে যাওয়াটা নিশ্চিত।

দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের উন্নয়নের গতি একটু শ্লথ হয়। কোনো স্বৈরতান্ত্রিক শাসককে রুখতে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে দেশের শাসক রাজনীতিকরা যখন মানুষের মঙ্গলের জন্য সঠিক লক্ষ্যে কাজ করেন তখন গণতন্ত্র সে কাজে বাধা না দিয়ে একটু অন্তরালে থেকে যায়। স্বৈরতন্ত্রগুলি গড়েই ওঠে দ্রুতগতিতে কোনো পরিবর্তন আনার তাগিদে। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা যদি দেশহিতে সঠিক সিদ্ধান্তগুলি নিতে পারেন সেক্ষেত্রে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাও কিন্তু জাদু দেখাতে পারে (সিঙ্গাপুর, ১৯৮০'র পরের চীন এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশ)।

অন্যদিকে তাদের ভুল সিদ্ধান্ত যে দ্রুত দেশের ধ্বংসও ডেকে আনতে পারে তার প্রমাণ জিম্বাবয়ে, উগান্ডা, রাশিয়া। এই দু'ধরনের দেশকেই পর্যবেক্ষণ করা বিশ্ব বিনিয়োগ ম্যানেজার রুচির শর্মা বলছেন দীর্ঘমেয়াদে এই দু' ধরনের ব্যবস্থাই একইরকম ফল দিতে পারে। কিন্তু তফাতটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক দেশে উন্নয়নের ফল ও প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী এবং দৃঢ় হয় তুলনায় স্বৈরতান্ত্রিক দেশের উন্নয়নের স্থায়িত্ব অনেকটাই ভঙ্গুর। এই ৭৩তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের সময় আমরা বিবেচনা করতে পারি ঠিক কোন মধ্যপন্থা অবলম্বন করলে (গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মধ্যেই) আমরা স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে খরগোসের দৌড়ে দ্রুত আমাদের কচ্ছপের ভূমিকা বসলে ফেলতে পারি। ভিন্ন পথ অবলম্বন করে চলেও ১৯৮০ সালের গোড়ার দিকেও চীনের সঙ্গে আমাদের উন্নয়নের হারে বিশেষ ফারাক ছিল না।

গণতান্ত্রিক ভারত নেহরুর সমাজতান্ত্রিক মডেল অনুসরণের ফলে বৃদ্ধির হারে পিছিয়ে পড়ে। স্বৈরতান্ত্রিক মাও-জে-দঙ্-এর অধীনে ও তার কিছু পরেও চীন লাগাতার ভুল সিদ্ধান্ত নিতে থাকে যেমন সাংস্কৃতিক বিপ্লব, মহা উলম্ফন, পরিবার পিছু এক শিশুনীতি প্রভৃতি। এর ফলে উল্লেখিত ৮০'র দশকের শুরুতে উভয়ের জিডিপি প্রায় একই জায়গায় ছিল।

আজকের তারিখে ফিরলে চীনের অর্থনীতির মাপ বা বিস্তার ১৩ ট্রিলিয়ন ডলার সেখানে ভারতের অবস্থান ২.৬ ট্রিলিয়নে। অর্থাৎ চীন ৫ গুণ এগিয়ে গেছে। মাথাপিছু চীনের জিডিপি'র হার ভারতের চেয়ে চারগুণ বেশি। আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্যের জটিল হিসেব নিকেশ নির্ভরতার কারণে ভারতের অগ্রগতিকে অযথা খাটো করে দেখা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ক্রয় ক্ষমতার সমতার (Purchasing Power Parity) ভিত্তিতে যে হিসেব এসেছে সেই অনুসারে ভারতের জিডিপি-র বিকল্প পরিমাণ হবে ১০.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের সমতুল্য। চীনের এই পদ্ধতিতে জিডিপি ২৫.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। তাহলে প্রথম হিসেব অনুযায়ী ৫ গুণ বেশি নয়। পিপিপি-র হিসেব পদ্ধতিটি কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক অনুমোদিত। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী চীন মোটামুটি আড়াইগুণ এগিয়ে আছে। এটিই হচ্ছে দু' দেশের মধ্যে ১৯৮০ সালের পর অর্থনীতির গতি প্রকৃতির প্রকৃত ফারাক।

> ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করলেই রাতারাতি যে আমরা চীনকে ধরে ফেলব এমনটা নয়। জিডিপি বৃদ্ধি লাফিয়ে বেড়ে যাবে সেটা আশা করাও ভুল। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে যে কোনো বাড়তি বৃদ্ধিই আমাদের ক্রম উন্নতির পথে নিয়ে যাবে।

মাও-এর মৃত্যু (১৯৭৬)-এর পর চীন এমনকী মহা-খরগোসের টোটকা আবিষ্কার করে এতটা এগিয়ে গেল আর ১৯৯১-এ সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করেও আমরা পিছিয়ে রইলাম। তফাৎ হচ্ছে ১৯৮০ সালের আগে থেকেই স্বৈরতান্ত্রিক চীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই দুটি ক্ষেত্রেই বহুদূর এগিয়ে ছিল। '৮০ সালের আগেই চীনে শিক্ষিতের হার যেখানে ছিল ৬০ শতাংশ ভারতে তা ছিল ৪০ শতাংশ। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার ও লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণেও তারা ছিল অনেক এগিয়ে। আজকের তারিখেও আমাদের এই পশ্চাৎপদতায় কোনো ইতরবিশেষ হয়নি। ইউএনডিপি (রাষ্ট্রসঙ্ঘের)-এর সাম্প্রতিক মানব সংসাধন সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে চীনের স্থান যেখানে ৮৬ ভারতের ১৩১। কিন্তু মোদী সরকারের নেওয়া স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আয়ুষ্মান ভারত, স্বচ্ছ ভারত প্রভৃতি ছাড়া উভয়দেশের বৃদ্ধির ফারাক বোঝাতে শিক্ষা ক্ষেত্রেও যে

প্রকল্পগুলি জারি আছে তার ফলে আগামী ১০ বছর সময় সীমায় কে এগিয়ে থাকবে তা নিয়ে বাজি ধরলে চীনকেই এগিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু ২০৩০ থেকেই বাজি পাল্টে যাবে। শুরু হবে ভারতের খেলা।

ভারতে দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রেও সামগ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির (Gross enrolment Ratio) অর্থাৎ ভর্তি হতে পারার যোগ্যতা আছে এবং উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হয়েছে এই অনুপাতে অত্যন্ত ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। যেমন অতীতে যদি যোগ্যদের ১০ জনের মধ্যে ৩ জন ভর্তি হতো এমন ৬ জন হচ্ছে। বাস্তবে এই তাৎপর্যপূর্ণ অনুপাত ২০১০-১১ ১৯.৪ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ২৫.২এ উন্নীত হয়েছে এবং বেড়ে চলেছে। World datalab of Brooking Institutions-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী এই বছরে ভারতে গরিবের মোট সংখ্যা ৪ কোটিতে নেমে আসবে। এর ফলে সমগ্র জনসংখ্যার নিরিখে তা মাত্র ৩ শতাংশে দাঁড়াবে। শীঘ্র প্রকাশিতব্য এনএসএস-এর পরিসংখ্যান হাতে এলেই বোঝা যাবে এই পরিসংখ্যানের যথার্থতা। চীন জমির মালিকানা ও শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে জোর জুলুম করে কাজ হাসিল করে। দেশের সামগ্রিক সঞ্চিত অর্থ (domestic savings) জোর করে কুক্ষিগত করে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও রপ্তানিযোগ্য (পণ্য উৎপাদন) বাণিজ্যে ঢালাও লগ্নি করে। এই ধরনের বাড়াবাড়ি, জোর জবরদস্তি একই সঙ্গে ও শিশু নীতি যা '৭০-এর শেষ দিকে নেওয়া হয়েছিল তার পরিণতি আগামী দিনে আরও ভয়ঙ্কর হতে চলেছে। সামাজিক অস্থিরতা ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত বয়সের নিয়োগযোগ্য লোকের অভাব দেখা দেবে।

ভারতে যদিও আমরা ভূমি সংস্কার ও শ্রম আইনের সংশোধন নিয়ে নিরন্তর কঠিন চেষ্টা করে চলেছি তারই মধ্যে দারিদ্রসীমায় হ্রাস ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির স্বাভাবিক ফলস্বরূপ আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে লাগাম পড়েছে। আমাদের দেশের অগ্রগতির ট্র্যাকে থাকর কারণে দেশের মানুষের কাজ করার বয়সসীমা, প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বাড়তেই থাকবে। আমাদের আভ্যন্তরীণ শিল্পনীতি একটু ঠিক করে নিতে পারলে বিশ্বে যে বিপুল সস্তা পুঁজি অনিয়মিত রয়েছে তা ভারতে আসতে বাধ্য।

তাহলে এই সাফল্য পেতে গেলে আমাদের কী নীতি নিতে হবে? প্রথমত, রাজ্যগুলিকে আরও অধিক ক্ষমতা প্রদান বিশেষ করে শহরগুলিকে। শহরের ব্যাপ্তির বিষয়টা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। শহরাঞ্চলে সুযোগ্য, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও নিবিড় শহরীকরণই উন্নয়নের চাবিকাঠি। একই সঙ্গে চাকরিরও উৎস। ২০১৮ সালের হিসেবে ভারতে ৩৩ শতাংশ শহরীকরণ হয়েছে যেখানে চীন ৫৮ শতাংশ। এর মধ্যে লক্ষণীয় হচ্ছে চীনের শহরীকরণের উৎকর্ষ। চীনের শহরীকরণ হয়েছে পূর্ব সামুদ্রিক উপকূল ধরে। যেখানে ভারতের শহরীকরণ মেট্রো শহরগুলির নানা বিক্ষিপ্ত বড়ো বড়ো অঞ্চলকে ঘিরে। শহরের যে আদি বিশেষত্ব (যেমন কোথাও হয়তো কাছাকাছি নদী রয়েছে, কোথাও একই ধরনের দ্রব্যের কারখানা) এগুলিকে বেছে নিয়ে এখানে সামাজিক, ব্যবহারিক পরিকাঠামোয় উন্নয়ন করতে পারলে বাড়তি সুবিধে পাওয়া যেতে পারে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রের সঙ্গে কম খরচের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার। এই বিষয়টা কিন্তু চীন মাও-এর আমলেও সফলভাবে করতে পেরেছিল। এর ফলে 'দেং ঝিয়া পেঙ'-এর জমানায় সরকারি নীতিতে যখন আরও জনমুখী পরিবর্তন এল শিক্ষাক্ষেত্র তখন শিক্ষাক্ষেত্র আগে থেকেই এগিয়ে থাকায় বিশাল উন্নতি করল। তৃতীয়ত, কর ব্যবস্থায় সংশোধন এনে পুঁজির বাড়তি বিনিয়োগের রাস্তা সহজ ও আকর্ষণীয় করা দরকার। পুঁজি এলেই কর্মী তৈরি হবে।

তবে, এই ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করলেই রাতারাতি যে আমরা চীনকে ধরে ফেলব এমনটা নয়। জিডিপি বৃদ্ধি লাফিয়ে বেড়ে যাবে সেটা আশা করাও ভুল। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে যে কোনো বাড়তি বৃদ্ধিই আমাদের ক্রম উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো সংঘাতের পরিস্থিতির সৃষ্টি না করেও এটা করা সম্ভব। ২০২৪ সালের মধ্যে ভারতের অর্থনীতির বহর ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছবার যে পরিকল্পনায় প্রধানমন্ত্রী সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ চেয়েছেন তা হয়তো পূরণ হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি ২০৩০-এর গোড়ায় দেশের অর্থনীতি ১০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ছুঁয়ে ফেলবেই। আমি নিঃসংশয়।

(লেখক স্বরাজ্য পত্রিকার সম্পাদক)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই
স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।
টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।
ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

রম্যরচনা

সেলসম্যানশিপ

একবার সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি একটি স্টেশনারি দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডায়মন্ড বল পেন আছে?'

সেলসম্যান মুখের উপর বলে দিল, 'নেই।'

চলে যাচ্ছেন। নিজেই ফিরলেন। সৈয়দ মুজতবা আলি তাঁদের বোঝালেন, সেলসম্যানশিপ কী? যখন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ডায়মন্ড বল পেন আছে কি, তাঁদের বলা উচিত ছিল ডায়মন্ড নেই তবে পাওয়ার, সুলেখা, ব্রাইট...ইত্যাদি আছে। ক্রেতাকে বিকল্প না দেখিয়ে বিদায় করাটা ঠিক না। সেলসম্যানরা লজ্জিত হলো কিন্তু শিখল।

কিছুক্ষণ পর সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় এসেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'টয়লেট পেপার আছে?'

সৈয়দ মুজতবা আলির দীক্ষিত সেলসম্যান উত্তর দিলেন, 'টয়লেট পেপার একটু আগে শেষ হয়েছে। তবে শিরীষ কাগজ আছে। দেবো?'

উবাচ

"৩০ শতাংশ ভোটের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কাজ করছেন। আমরা কেন্দ্রকে জানাব, এমন একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকারের আদৌ ক্ষমতায় থাকা উচিত কি না।"

সায়ন্তন বসু
রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক

মমতার কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রসঙ্গে

"বালুচিস্তান স্বাধীন হলে কোয়েটায় বসবে নরেন্দ্র মোদীর মূর্তি।"

নায়েলা কাদরি বালুচ
বিশ্ব বালুচ মহিলা ফেডারেশনের সভাপতি

বালুচিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধে নরেন্দ্র মোদীর অবস্থান প্রসঙ্গে

"হিন্দুদের অনুভূতিকে আমি শ্রদ্ধা করি। আদালত যদি অযোধ্যার বিতর্কিত জমি আমাকে দেয় তাহলে আমি সেই জমি রাম মন্দিরের জন্যই দান করব।"

হাবিবুদ্দিন তুসি
বাবরের বংশধর

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে

"আসুন, আমরা পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে মুক্ত করতে এবং দেশের অভিন্ন অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে ইতিবাচক ভাবনাচিন্তা নিয়ে এগিয়ে চলি।"

জিতেন্দ্র সিংহ
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে পাক-বিরোধী বিক্ষোভ প্রসঙ্গে

৩৭০ ধারার অবলুপ্তির মাধ্যমে কাশ্মীরের রাহুমুক্তি ঘটল

পুলকনারায়ণ ধর

অবশেষে ভারতের সংবিধানের দুষ্টক্ষত ৩৭০ নম্বর ধারা ও ৩৫(ক) ধারা এক মোক্ষম 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'-এ অপসারিত হলো। এই ধারার বিলুপ্তির মাধ্যমে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ হলো। স্বাধীনতার পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসে এটা এক বিস্ময়কর ও যুগান্তকারী ঘটনা। গত ৭০ বছর ধরে এই ৩৭০ ধারা ভারতের সংবিধানকে অপাঙ্গ করে রেখেছিল। কোনো সরকার বা নেতা-নেত্রীর সাহস হয়নি এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মৌলশক্তিকে উচ্ছেদ করার। এই কাজটি করে দেখালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী ও অমিত শাহ। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার মাত্র ৫৫ দিনে এত বড়ো একটি সাহসিক পদক্ষেপ যা তাদের দলীয় 'সংকল্পপত্রে' ঘোষিত হয়েছিল তা তাঁরা করে দেখালেন।

কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু অন্যান্য অংশের সঙ্গে এর সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অস্মিতা ছিল না। কারণ ৩৭০ ধারা। কাশ্মীরের জন্য পৃথক পতাকা, পৃথক সংবিধানের অস্তিত্ব ৩৭০ ধারায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সর্বদাই এই পতাকা ও সংবিধান কাশ্মীরের নেতা ও মানুষদের মনে একটি পৃথক সত্তার ও অধিকারের কথা মনে করিয়ে দিত। এ ছাড়া ছিল দ্বৈত নাগরিকতা। অর্থাৎ কাশ্মীরে যারা স্থায়ী অধিবাসী তারা একই সঙ্গে কাশ্মীরের নাগরিক এবং ভারতেরও নাগরিক। ৩৭০ ধারার বিলুপ্তির মাধ্যমে এই অদ্ভুত ব্যবস্থার অবসান ঘটল। ৩৭০ ধারা অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে যে দেওয়াল তুলে রেখেছিল তা এক লহমায় যেন বার্লিন প্রাচীরের মতন ভেঙে গেল। এই পদক্ষেপে বিরোধীরা হতচকিত ও দিশেহারা হয়ে গেছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা এই ঘটনা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেনি। এই কৌশলও অত্যন্ত পরিণত বুদ্ধির পরিচায়ক। মনে রাখতে হবে যে, কাশ্মীরে দীর্ঘকাল ধরে পাকিস্তান 'প্রক্সি' যুদ্ধ চালিয়ে আসছে। এবং সংবিধানের ৩৭০-র সুবিধা ও সুযোগ নিয়ে স্থানীয় উগ্রপন্থীদের পাকিস্তান কাজে লাগাচ্ছিল। যুদ্ধ রক্তপাত ও হিংসা বর্জিত কূটনৈতিক বা রাজনৈতিকও হয়। কাশ্মীরের যুদ্ধক্ষেত্রে ৩৭০ ধারা বিলোপের সিদ্ধান্ত একটি অহিংস রাজনৈতিক 'স্ট্র্যাটেজি' এবং অবশ্যই তা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। দিশাহীন কংগ্রেস সংসদে তা দ্বিপাক্ষিক বা আন্তর্জাতিক বিষয় করে তোলার চেষ্টা করেছিল। তাদের ব্যর্থতা করুণার উদ্রেক করে। ৩৭০ ধারার বিষয়টি কী এবং ভারতের সংবিধানে তা কীভাবে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল সে সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা বুদ্ধিমান বা শিক্ষিত বহু মানুষেরও কোনো বিশেষ ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। এর বিলুপ্তির ঘটনা ও তা নিয়ে রাজনীতির উত্তাপে ৩৭০ ধারা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ কিঞ্চিৎ উৎসাহী হয়েছে। অর্থাৎ ৩৭০ ধারা বলবৎ থাকতে তার মর্মার্থ আমরা বুঝতে চেষ্টা করিনি। বর্তমান সে 'মরিয়া প্রমাণ করিল' এরকম একটি বৈষম্যমূলক ধারা আমাদের সংবিধানে ৭০ বছর ধরে ছিল। ৩৭০ ধারা কীভাবে সংবিধানে প্রবিষ্ট হলো এবং কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তা ঘটেছিল সে দীর্ঘ ইতিহাস অনুসন্ধান স্থগিত রেখে এই ধারায় কী ছিল এবং তা সাধারণ ভারতীয় নাগরিকদের কীভাবে অনধিকারের আষ্টেপৃষ্ঠে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে রেখেছিল তা সংক্ষেপে বিচার করা যেতে পারে। কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার পর রাজা হরি সিংহের প্রবল বিরোধী ও জওহরলাল নেহেরুর বন্ধু শেখ আবদুল্লার জোড়াজুড়িতে ৩৭০ ধারা গৃহীত হয়। ১৯৪৯ সালে শেখ আবদুল্লাকে খুশি করার জন্য হরি সিংহকে গদিচ্যুত করা হয়। এরজন্য নেহরু ছিলেন সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। সবার উপর অবশ্য মাউন্টব্যাটনের চাপ ছিল তীব্র। কারণ হরি সিংহই একমাত্র দেশীয় রাজা ছিলেন যিনি ১৯৩১ সালে ইংল্যান্ডে 'গোলটেবিল' বৈঠকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করেছিলেন। এর পরিণতি হিসেবে ইংরেজরা আবদুল কাদির নামে এক মোল্লার নেতৃত্বে কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক জেহাদ শুরু করে দিয়েছিল। শেখ আবদুল্লা এরই প্রভাবে গড়ে তোলেন 'মুসলিম কনফারেন্স' দল যা বর্তমানে 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' নামে পরিচিত। নেহরুর কাশ্মীর বিষয়ক সচিব ছিলেন গোপাল স্বামী আয়েঙ্গার। গণপরিষদে তিনিই ৩৭০ ধারার প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। প্রায় কোনো আলোচনাই নেহরু এ বিষয়ে করতে দিলেন না। দ্রুত তা গৃহীত হয়ে যায়। কিন্তু এর বিলুপ্তি সাধনের প্রস্তাব বর্তমান সংসদে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা আলোচিত ও ভোটাভুটি হয়েছে। তবুও সেদিন তা ছিল 'গণতান্ত্রিক' এবং আজ বিরোধীদের বিচারে, যার মধ্যে নেহরুর উত্তরসূরি কংগ্রেস তথা রাহুল গান্ধীও আছেন, তা বিবেচিত হলো অগণতান্ত্রিক বলে। এ এক হাস্যকর ব্যাপার!

'পদ্ধতিগত' ভাবে তা অগণতান্ত্রিক এই কথার আড়ালে মোদী বিরোধীরা নিজেদের প্রকৃত অবস্থান লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট। কারণ দলমত নির্বিশেষে ভারতের সাধারণ মানুষ কাশ্মীরের এক অবাঞ্ছিত ও অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বহুদিন আগেই রদ করতে চেয়েছিল। আজ তা কার্যকর হওয়ায় তাদের খুশির অন্ত নেই। এই অবস্থায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি যদি এই ৩৭০ ধারার বিলুপ্তি ও রাজ্য পুনর্গঠনের বিরোধিতা করে তবে তাদের দলের সমর্থকরাই দলে দলে নেতাদের ছেড়ে যাবে যা কংগ্রেস দলের মধ্যেই এখন দেখা যাচ্ছে। এটা গেল কাশ্মীরের বাইরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের মনোভাবের কথা। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে যারা নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভারতীয় নাগরিক হয়ে নিজ বাসভূমে পরবাসীর তকমা বহন করে চলছিল তাদের মনোভাব ও প্রতিক্রিয়াই আসল। বলা বাহুল্য জম্মু-কাশ্মীরের (লাদাক সহ) অমসুলমান নাগরিকরা বহু যুগের অগণতন্ত্র, অনৈক্য ও ধর্মীয় নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি

পেয়ে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পেল। বাহারি মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের কথা ভেবে যাদের প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে এবং যারা পদ্ধতিগত গণতন্ত্র লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে অশ্রুমোচন করছেন তারা কি আদৌ ভেবে দেখেছেন জম্মু ও লাদাখ, কাশ্মীর উপত্যকার বহু মানুষ এত বছর ধরে কোন দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল? তারা কি জানেন না কাশ্মীর উপত্যকা থেকে সাড়ে তিন লক্ষ হিন্দু পণ্ডিতকে গৃহছাড়া করা হয়েছে? তারা আজ দিল্লির পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিজ বাসভূমি হারিয়ে? হিন্দু মেয়েদের সম্ভ্রম লুঠ করা হয়েছে? মানবাধিকারওয়ালারা কী তাদের 'মানুষ' বলে মনে করেন না? কী উত্তর আছে তাদের কাছে? উত্তর নেই। কারণ এরা বেতনভুক জাতি-বিরোধীদের দল।

প্রশ্ন এই যে কেন জম্মু-কাশ্মীরে উপজাতি, জনজাতি, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন বিভিন্ন ধর্মের মানুষরা শুধু 'কাশ্মীর' উপত্যকার মুসলমান রাজনীতিক দ্বারাই পরিচালিত হতে বাধ্য ছিল? প্রশ্ন এই যে, কেন বিপুল অর্থ শুধুমাত্র কাশ্মীরের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হতো এবং যার জন্য অন্যান্য ভারতীয়দের করের বোঝা বইতে হতো তার প্রধান অংশ কাশ্মীর উপত্যকার জন্য ব্যয়িত হতো কেন? লাদাক নামক অঞ্চলটি ছিল চরম উপেক্ষিত। এই কারণেই যে এই অঞ্চলটি জওহরলাল নেহরু বাতিলের খাতায় রেখেছিলেন। বলেছিলেন এমন একটি জায়গায় কী বিশেষ গুরুত্ব আছে? কারণ 'Not a blade of grass grows there'। স্বাধীকার-পন্থীরা কি কোনো জবাব দেবেন? একথা আজ প্রকাশ্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে দুটি পরিবার এই ৩৭০ ধারার আড়ালে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে এসেছে এত কাল ধরে। সেকুলারবাদী গণতন্ত্রবাদীরা কি ভেবে দেখেছেন সারা ভারতে যে Prevention of corruption Act, 1988 তা কাশ্মীরের ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য নয়? ৩৭০ ধারার আড়ালেই চলেছিল গণতন্ত্রের কবন্ধ নৃত্য। এই ৩৭০ ধারার বাধাতেই কাশ্মীরে তার উপযুক্ত শিল্প তথা বাণিজ্য ভারতের অন্যান্য নাগরিকরা করতে পারত না। সেখানে শরিয়া আইন মানুষের বিশেষ করে মহিলাদের ফাঁসের দড়ির মতো বলবৎ ছিল। এই কি ব্যক্তি স্বাধীনতা? এটাই কি গণতন্ত্রের মহিমা? এই ব্যবস্থার আড়ালেই গড়ে উঠেছে দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারের পরিবারতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থাকেই মদত দিয়ে এসেছে পাকিস্তান ও কাশ্মীরের অভ্যন্তরে তাদের শাগরেদরা।

এদের হাত ধরেই এসেছে তথাকথিত 'আজাদি চাই'-এর স্লোগান। গোটা দেশের সঙ্গে কাশ্মীরকে মিশতে দেওয়া হয়নি। অথচ গোটা দেশের মানুষের করের টাকায় কাশ্মীরের তথাকথিত 'স্বাধিকার' বা 'অটোনমি'র মোচ্ছব চলত। নির্বাচন যে ভাবে সংঘটিত হতো তা ছিল গণতন্ত্রের 'ক্যারিকেচার'। উগ্রপন্থীদের গুলি ও ভীতির মুখে গণতন্ত্র চৌপাট। সামান্য কিছু মানুষকে ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হতো। শেখ আবদুল্লার পুত্র ও পৌত্রবর্গ এতেই খুশি। কারণ লুঠপাটের রাজনীতিতে এর চেয়ে বেশি গণতন্ত্র তাদের সহ্য হতো না। কারণ তাঁরা একই সঙ্গে ভারতীয় নাগরিক এবং কাশ্মীরের নাগরিক (দ্বৈত নাগরিকতার আবিষ্কার)। গাছেরও খাবো, তলারও কুড়াবো। এতো ভারী মজার গণতন্ত্র। ভারতের সংবিধানের তামাক খাবো, আবার কাশ্মীরের পৃথক সংবিধানেরও ডুডুও খাবো। গণতন্ত্র প্রেমী মানবশিশুরা আজ এই ব্যবস্থা বা ধারার বিলোপ সাধনে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। কারণ আজ কাশ্মীরে ভারতের যে কোনো প্রান্তের মানুষের কাশ্মীরে জীবন যাপনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। বিবাহ ও সংসারধর্ম পালন করার ক্ষেত্রেও কোনো বিধিনিষেধ রইল না। বাল্য বিবাহ প্রথা রহিত হবে। জম্মু ও লাদাখ অঞ্চলে অমুসলমানদেরই সংখ্যাধিক্য। জম্মুতে ৬৬% এবং লাদাকে ৫৪% মানুষের জনজাতির বসবাস। আজ জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় জাতীয় পতাকা ছাড়া অন্য কোনো পতাকা উড়বে না। এতকাল কাশ্মীরের পৃথক পতাকা উড্ডীন থাকত। আজ কাশ্মীরে ভারতের সংবিধানের সমস্ত মৌলিক অধিকার সমান ভাবে সমস্ত নাগরিক উপভোগ করতে পারবে।

৩৭০ নম্বর ধারা যে অবিচার আর জটিলতায় কাশ্মীরকে মুড়ে রেখেছিল তা দ্বিজাতিতত্ত্বের চরম পরিণতি। আবদুল্লার বংশধররা ও সৈয়দ বংশীয়রা ৩৭০ ধারা ব্যবহার করে স্বার্থসিদ্ধি করে গেছেন। আমলা, ব্যবসায়ী, বিচারপতি, আইনজীবীরা এক দুর্ভেদ্য দুর্নীতি চক্রের সৃষ্টি করেছিল। এই চক্রের মাধ্যমেই এবং এদের স্বার্থে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্ম। এ প্রসঙ্গে অন্য সময় আলোচনা করা যাবে। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী ও উগ্রপন্থীরা যে-কোনো নির্বাচিত সরকারকেই তাদের গোলাম করে রাখত। এই দুর্নীতিগ্রস্ত মেরুদণ্ডহীন নির্বাচিত সরকারগুলিকে এরা ব্ল্যাকমেল করে কাশ্মীরের তথা ভারতের নিরাপত্তাকে ভয়ংকর ভাবে বিপদগ্রস্ত করে তুলেছে। এই ব্যবস্থাকে যিনিই বাধা দিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধেই এরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে জগমোহনের নাম উল্লেখ করা যায়। জগমোহন ১৯৮৪ এপ্রিল থেকে ১৯৮৯ জুলাই এবং ১৯৯০ সালের জানুারি—মে দুবার জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল ছিলেন। তাঁর কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা কাশ্মীরের কায়েমিস্বার্থের পক্ষে ছিল বড় বাধা। সুতরাং নানা অপবাদ ও অপমান করে তাঁকে সেখান থেকে সরান হয়েছিল। এই প্রচেষ্টায় চন্দ্রশেখর (প্রধানমন্ত্রী), রাজীব গান্ধীর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। অপদার্থ ভারতীয় রাজনীতিকরাই কাশ্মীরের ৩৭০ ধারাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন।

যুগ যুগ ধরে কাশ্মীরের 'না ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থা এতটাই স্থায়িত্ব পেয়েছে যে এটা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি ভারতীয়েরই ভাবনা ছিল যে এই রাজনৈতিক অচলাবস্থা অবস্থা থেকে আমাদের কোনো দিনই মুক্তি হবে না। কিন্তু বর্তমান এনডিএ সরকারের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ-র এক বলিষ্ঠ সাহসিক পদক্ষেপে এক ঝটকায় অনন্য রাজনৈতিক 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'-এর ফলে কাশ্মীর আজ ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলির সঙ্গে সমান পঙ্‌ক্তিতে অবস্থান করছে। রক্ষিত হলো ভারতীয় অস্মিতা।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন 'এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান' সার্থক করে কাশ্মীর আজ প্রকৃতঅর্থেই রাহুমুক্ত হলো।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম ভারত-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ দাস

শিবভক্ত ঋষি কশ্যপের দেশ কাশ্মীর প্রথমে এক স্বাধীন রাজ্য ছিল। রাজা অমর সিংহের ছেলে হরি সিংহ হলেন শেষ রাজা (১৯২৫-১৯৪৯)। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় হরি সিংহ চেয়েছিলেন কাশ্মীর পাকিস্তান আর ভারতের মাঝে এক 'বাফার স্টেট' হয়ে ইউরোপের ভূস্বর্গ সুইজারল্যান্ডের মতোই স্বমহিমায় এক স্বাধীন রাজ্য হিসাবে গণ্য হোক। কিন্তু তিনি জানতেন না যে গত ১৪০০ বছরের মুসলমান আক্রমণে কাশ্মীরের বেশিরভাগ অঞ্চলই মুসলমান অধ্যুষিত হয়ে পড়েছে। আর শেখ আবদুল্লা তাদের জনপ্রিয় নেতা বেশ ভালোই পশার জমিয়ে ফেলেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমানরা তাদের চিরাচরিত মানসিকতায় হিন্দু রাজা হরি সিংহকে অস্বীকার করেছিল। অন্যদিকে জম্মুর ডোগরারা শুধু রাজা হরি সিংহকে তাদের অধিনায়ক হিসাবে মেনে নিয়েছিল। কাশ্মীরি ব্রাহ্মণরা অসহায় ছিল, কারণ তারা বাস করতো সংখ্যাগুরু মুসলমানদের মধ্যে। তাই তাদেরকে শেখ আবদুল্লাকেই বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। একই সময়ে পাকিস্তান নামে এক ইসলামিক দেশের জন্ম হয় ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে। হরি সিংহ তাঁর প্রধানমন্ত্রী দেওয়ানজীর পরিবর্তে বিশ্বাসঘাতক শেখ আবদুল্লাকেই প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যখন পাকিস্তানি সেনারা পার্বত্য উপজাতি 'কাওয়ালিয়া'র ছদ্মবেশে শ্রীনগর প্রায় দখল করে নিচ্ছিল, তখন 'ইন্সট্রুমেন্ট অব অ্যাক্সেসন'-এর মাধ্যমে মাউন্টব্যাটনের মধ্যস্থতায় ভারতের মধ্যে বিলীন হতে সম্মত হন। উপায়ান্তর না দেখে তাকে শেখ আবদুল্লার দাবিদাওয়াও মেনে নিতে হয়। এটা ছিল এক অসহায় হিন্দু রাজার ধূর্ত, নৃশংস ও কুটিল মুসলমানের সঙ্গে এক আপোশচুক্তি। সেই সময় স্বাধীন ভারতে ছিল জওহরলাল নেহরু

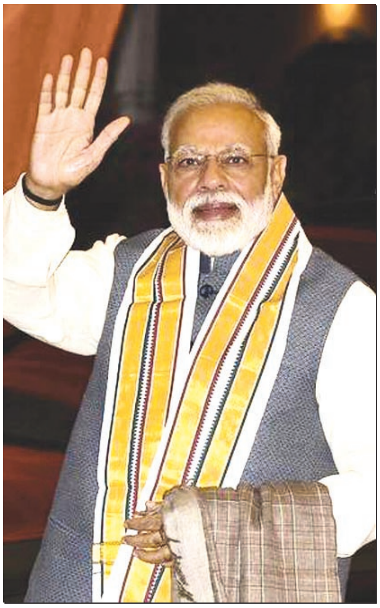

আর গান্ধীজীর একচেটিয়া অধিকার। শেখ আবদুল্লার দাবিতে কাশ্মীরের জন্য 'বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকারে'র ব্যবস্থা করে, ১৯৫৪ সালের ১৪ মে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের অনুমতিতে সংবিধানে ৩৭০ ধারা আর পরে অনুচ্ছেদ ৩৫এ লাগু হয়। সেই শর্তে 'স্থায়ী আর অস্থায়ী' বাসিন্দাদের সুযোগসুবিধার কথা ছিল। স্থায়ীরা ভোটের অধিকার, সংরক্ষণ, সরকারি অনুদান, চাকরি, স্বাস্থ্য আরও নানা প্রকার অর্থনৈতিক সুযোগ পাবে। অস্থায়ীরা তা থেকে বঞ্চিত হবে। এছাড়া কাশ্মীরের জন্য হবে আলাদা পতাকা, সংবিধান এবং প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের বীরসন্তান শ্যামাপ্রসাদ শেখ আবদুল্লার 'থ্রি নেশন থিয়োরি এবং ভারতের বলকানাইজেশনের' চালাকি ধরতে পেরেই ঘোষণা করেছিলেন 'এক বিধান, এক নিশান, এক প্রধান'-- এই নীতি গ্রহণ করতে হবে। কাশ্মীর দেশের অভিন্ন অঙ্গ হয়েও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। শ্যামাপ্রসাদের দৃপ্ত বিরোধিতার জন্য নেহরু এবং শেখ আবদুল্লার ষড়যন্ত্রে ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন মাত্র ৫১ বছর বয়সে শ্রীনগরের জেলে মধ্যরাত্রে রহস্যজনক মৃত্যু হয় ভারতমাতার এই বীর সৈনিকের।

পাকিস্তানের কুখ্যাত আই এস আই, হুরিয়ত কনফারেন্স, মুফতি মহম্মদের পিডিপি ফারুক আবদুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্স, কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে, গত ৭২ বছর ধরে সমস্ত ভারতবাসীকে শুনিয়ে এসেছে যে, ধারা ৩৭০ ধারাকে কোনোরকমেই খারিজ করা যাবে না। করলেই কাশ্মীরে ১৯৪৭ সালের পুনরাবৃত্তি হবে। কিন্তু এই ধারাটি যে সাময়িক এবং রাষ্ট্রপতির আদেশে যে একে খারিজ করা যায়, সেটিকে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বারবার কিসের স্বার্থে আর কার স্বার্থে? সাধারণ মানুষ বেমালুম ভুলে গেছিল এই শর্তের কথা। গত ৭২ বছরে কেউ সাহস করে এই কথার উত্থাপন পর্যন্ত করেনি। আর করবেই বা কি করে, কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার আর রাজ্যে কমিউনিস্ট সরকার তারা আসলে হিন্দুদের শোষণ আর মুসলমানদের তোষণ করে তাদের দোকানদারি চালাচ্ছিল। কাশ্মীরের লোকসংখ্যা কম অথচ লোকসভার সিট আয়তন ও লোকসংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও জম্মু-লাদাখের চেয়ে বেশি থাকবে। কাশ্মীরের ১৮টি জেলার মধ্যে মাত্র ৫টিতে (শ্রীনগর, বারামুলা, পুলবামা, কুলগাঁও, অনন্তনাগ) আছে ১৫ শতাংশ পাকিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী সুন্নী মুসলমানরা। এরা চায় কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে। কাশ্মীর আজ হিন্দুশূন্য। জম্মুতে আছে ৬০ শতাংশ হিন্দু আর লাদাখে ৭০ শতাংশ বৌদ্ধ।

৩৭০ ধারার বলে অকাশ্মীরিদের কোনো সংরক্ষণ থাকবে না। কাশ্মীরি মুসলমানরা সারা ভারতে জমিজায়গা কিনতে পারবে, ব্যাবসাবাণিজ্য, বিয়ে-সাদি করতে পারবে কিন্তু সারা ভারতের কেউ সেই একই কাজ কাশ্মীরে করতে পারবে না। এই 'বিশেষ ক্ষমতা'র বলে জম্মু-কাশ্মীর-লাদাখ ভারতের মূলভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। ১৫ শতাংশ কাশ্মীরি সুন্নী মুসলমান ছাড়া কাশ্মীর, লাদাখ আর জম্মুর সব নাগরিকরাই কিন্তু ভারতের পক্ষে। তাহলে কেন

এই অশান্তি? কারণ হলো ন্যাশনাল কনফারেন্সের ফারুক আর তার পুত্র ওমর আবদুল্লা। ওমরের মা একজন ব্রিটিশ নার্স আর ওমরের প্রথম স্ত্রী পায়েল নাথ একজন কাশ্মীরি হিন্দু। এই দুই পরিবার--- মুফতি আর আবদুল্লাদের ছেলে-মেয়েরা বিদেশে আর গরিব ৫০০ টাকার পাথরবাজরা নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের মনিবদের 'খুশ' করছে। ৩৭০ ধারা যে 'কাগুজে বাঘ' ছিল সেটা অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদী, অজিত দোভাল আর এই মর্মান্তিক নাটকের কুশীলব বীর জওয়ানরা ভালোভাবেই প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন সমগ্র বিশ্বকে। পাকিস্তানের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও সংযুক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘ পর্যন্ত মেনে নিয়েছে মোদীর এই ৩৭০ ধারা রদকে। আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া এমনকী পাকিস্তানের দোস্ত চীন এবং ইসলামিক দেশগুলিও পাকিস্তানের জেহাদি আহ্বানে নীরব থাকাকে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছে। পাকিস্তান প্রথম থেকেই কাশ্মীরে বিচিছন্নতাবাদী নেতা জিলানি, ফারুক আবদুল্লা, মুফতি মহম্মদ সাইদ এবং আরও বেশ কিছু নেতাকে কাশ্মীরে হাঙ্গামা করিয়ে, আন্তর্জাতিক ইসু বানিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিয়ে গেছে, কিন্তু বারবার নিশ্চুপ থেকে ৫ লাখেরও বেশি কাশ্মীরি হিন্দুকে নির্মমভাবে হত্যা, লুট, ধর্ষণ, নির্যাতন এবং বিতাড়নের বিষয়ে। মুষ্টিমেয় লোক যারা অল্প কয়েকটি স্বার্থান্বেষী পরিবারের অন্তর্গত তারাই জঙ্গিপনাকে আর পাথরবাজদের তৈরি করেছিল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতির সোহর তারই কাকা জাভেদ ইকবাল, পাকিস্তানি পার্লামেন্টের এক স্থায়ী সদস্য ছিলেন। তাঁর এক মেয়ে ইরতিকা পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে, বর্তমানে লন্ডনের ভারতীয় দুতাবাসে কর্মরতা। আর এক মেয়ে ইলতিজা, মামা মুফতি তাসাদুকের সঙ্গে মুম্বাইয়ের বলিউডে কর্মরতা। ১৯৮৯ সালে মেহবুবার আর এক বোন রুবাইয়া মুফতিকে অপহরণের মিথ্যা নাটকের ষড়যন্ত্র করে পাঁচ নৃশংস জঙ্গিকে কাশ্মীরের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সাইদের আদেশে। আর সেই বছরেই শুরু হয়ে যায় কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিধন যজ্ঞ ন্যাশনাল কনফারেন্স আর কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রে।

ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে সহজেই ভ্রমণবিলাসীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে স্থানীয় লোকদের উপার্জনের ভালো উপায় করা যায়। লাদাখের বিস্তীর্ণ ভূভাগে (প্রায় ৬০,০০ বর্গকিলোমিটার) সৌরশক্তির উৎপাদনের উপযোগী করা যায়। কিন্তু ওই সব ভ্রষ্ট নেতারা চায় ভারতের কাছ থেকে শুধু টাকা যার দ্বারা তারা কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ করতে। এতদিন তাই চলছিল নির্বিবাদে।

কেন কাশ্মীর অন্য প্রদেশের তুলনায় এত গরিব, যদিও অন্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশি অনুদান পেয়ে থাকে। কাশ্মীরে আপনি জমি কিনতে পারবেন না, ব্যবসা চালাতে পারবেন না। কাশ্মীরের মোট রাজস্বের ৭৫ শতাংশ আসে কেন্দ্র থেকে। আর সেটা আমার আপনার ট্যাক্সের টাকায় সম্ভব হয়। কংগ্রেসের আমলে মাত্র ১৫ বছরে কাশ্মীর পেয়েছিল ২ লক্ষ ৭৭ হাজার কোটি টাকা অনুদান। কোনো উন্নয়ন তো হয়নি! প্রত্যন্ত গ্রামে ছিল না বিদ্যুৎ বা জলের ব্যবস্থা। কী হলো এত টাকা? সব খেয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী শাহ-জিলানিরা আর শ্যামাপ্রসাদের হত্যাকারী ফারুক আর ওমর আবদুল্লার পরিবারের মতো গুটিকয় পাকিস্তানপন্থী মুসলমান নেতারা। তাদের অনেকেই যেমন জঙ্গি জইস-ই-মহম্মদের সালাউদ্দিন আর লস্কর-ই- তৈইবার মাসুদ আজহার এখন পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা। তাদের আত্মীয়স্বজনরা সব কংগ্রেসের দয়ায় ভারতের বিভিন্ন সরকারি বিভাগে উচ্চপদে কর্মরত। বিচার বিভাগ, সুরক্ষা বিষয়ক বিভাগ, ব্যাঙ্ক, শিক্ষা পরিষদে আসীন। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নিযুক্তিই বলে দেয় নেহরুর গুপ্ত উদ্দেশ্যটা কী ছিল! তিনি আরবি-ফার্সি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানতেন না। হিন্দু সংস্কৃতির ব্যাপারে অজ্ঞ, তবুও ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের পেতে হলো এমন একজন শিক্ষামন্ত্রী যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন ও অজ্ঞ। আর সেই কংগ্রেসকে ভারতবাসী গত ৭২ বছর ধরে ভোট দিয়ে এসেছি। একটা ছোট্ট পরিসংখ্যান দিচ্ছি। ২০১১-২০১২ সালে ভারত সরকার প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য মাথাপিছু খরচ করেছিল ৩৬৮৩ টাকা আর কাশ্মীরিদের জন্য সেই পরিমাণ ছিল ১৪২৫৫ টাকা। গত বছর মোদী সরকার ২০১৭-২০১৮ সালে প্রতিটি ভারতবাসীর উন্নয়নের জন্য যখন ৮২২৭ টাকা বরাদ্দ করেছে সেখানে কাশ্মীরিদের জন্য ২৭৩৫৮ টাকা। অর্থাৎ কাশ্মীরের বিচ্ছন্নতাবাদী, অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, পাথর-ছোঁড়া মুসলমানদের জন্য আমাকে আপনাকে অনেক টাকা দিতে হয়েছে যাতে করে তারা ফ্রিতে চাল-ডাল- আটা-তেল পেয়েছে। ৩৭০ ধারার আওতায় সবরকম সুযোগসুবিধা নিয়েছে আর দেশবিরোধী কার্যক্রম চালিয়েছে। ভারতের মোট জিডিপির ১০ শতাংশ খরচ হয় এই কাশ্মীরেই যেখানে দেখা যাচ্ছে তারা সমগ্র ভারতের নাগরিকদের তুলনায় ১ শতাংশেরও নীচে আছে। আর উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা ১৩.৫ শতাংশ কিন্তু জিডিপি মাত্র ৮.২ শতাংশ। আর এই জনবহুল প্রদেশ ভারতের অর্থনীতিতে যেরকম সহায়ক যোগদান করে তাঁর ১ শতাংশ কাশ্মীর করে না। আর এই 'শ্বেতহস্তী পোষা'র মতো ৩৭০ ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে মোদী সরকারের বিপক্ষে কারা কাজ করে চলেছে গোলাম নবি আজাদ, মমতা ব্যানার্জি, সীতারাম ইয়েচুরি, ড্যানিয়েল রাজা নামক বিষধর সাপেরা। ভারত সরকারের সমস্ত টাকা খরচ হয় জঙ্গিবাদের প্রচার প্রসারে। পাকিস্তানের মদত আছে সত্যি কিন্তু টাকা আসে বাকি ভারতবাসীর করের টাকা থেকে। পশ্চিমবঙ্গে মুয়াজ্জিনদের মাসিক বেতন কোথা থেকে আসে? আজ এখানে শ্যামাপ্রসাদের জন্যই বেঁচে আছেন হিন্দু হয়ে! আজ সেই পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস, সিপিএম আর এখন তৃণমূলের প্রশ্রয়ে মুসলমানরা কীভাবে হিন্দুদের উপর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

কাশ্মীরে ক্যাগের মতো দুর্নীতি দমনকারী সংস্থার কাজ করার অধিকার ছিল না। কাশ্মীরে ভারতের আইন অচল ছিল। এতদিন আলাদা পতাকা, সংবিধান আর আলাদা প্রধান ছিল। সেখানে মুফতি আর আবদুল্লা পরিবারের একমাত্র অধিকার, যেন তাদের 'বাপুতি সম্পত্তি' ছিল। কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-সহ সমস্ত বিরোধীদল আবার সেই অন্যায়কেই সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। সরকারের অনুদানের পয়সায় তারা জঙ্গিবাদকে জিইয়ে রেখে ভারতকে ব্ল্যাকমেল করে, ভয় দেখিয়ে নিজেদের পকেট ভরেছিল এতদিন। তাই মোদী-অমিত শাহর এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতের অভিন্ন অংশ জম্মু- লাদাখ-সহ কাশ্মীর ভারতমাতার মুকুটের মতো চিরদিন শোভাবর্ধন করতে থাকুক ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা। ■

পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ পেটানোর সংস্কৃতি অশনি সংকেত বয়ে আনছে

মনীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি রাতে কলকাতায় মেনকা সিনেমা হলের সামনে থেকে তিন মদ্যপ বাইক আরোহীকে টালিগঞ্জ থানার পুলিশ ধরে আনে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রাত ৯টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এই থানায় চেতলা বস্তির ৫০-৬০ জন পুরুষ ও মহিলা থানায় তাণ্ডব চালায়। তারা শুধু অপরাধীদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়নি, ফের দ্বিতীয়বার হামলা চালায় পুলিশ কর্মীদের ওপরে, অফিসার-ইন-চার্জের ঘরে এবং পুলিশকর্মীদের মেসে। আহত হন ৭ পুলিশকর্মী। এতবড়ো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও পুলিশ গুন্ডা দমনে ব্যর্থ হলো, লালবাজারে অতিরিক্ত বাহিনীও চেয়ে পাঠানো হলো না কেন, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। শুধু কলকাতাতেই নয়, মালদায় রতুয়ার পুলিশ ফাঁড়িতেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। যদিও রতুয়া ফাঁড়ির ঘটনায় প্রথমের দিকে পালিয়ে বাঁচার ছবি দেখা গেলেও পরে প্রতিরোধ করে পুলিশ।

ইতিপূর্বে গুন্ডাদের মারের ভয়ে থানার ভিতরে টেবিলের নীচে, আলমারির পাশে পুলিশকে আত্মরক্ষার জন্য লুকোতে দেখা গেছে। ২০১১ সালের পর থেকে সারা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় শয়ে শয়ে হিন্দুর ঘরবাড়ির জিনিসপত্র লুট হয়েছে, নারী নির্যাতন হয়েছে, পুরুষদের বেধড়ক পেটানো হয়েছে, অগ্নিসংযোগ করে সমস্ত গ্রামের বাড়ি ভস্মীভূত করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ঠুঁটো জগন্নাথের মতো দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারেনি। আর কালিয়াচক থানায় যেদিন গুন্ডারা আক্রমণ করে থানার গাড়ি, বাড়ি, নথিপত্র পুড়িয়ে দিয়ে পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল, পুলিশ ভয়ে থানা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল সেদিনই অপরাধীরা বুঝে গিয়েছিল এরাজ্যে জনতা পেটানোর পর পুলিশ পেটালেও আমাদের কোনো শাস্তি হবে না। কেননা পুলিশের মেরুদণ্ড বেঁকে গিয়েছে। যদিও বিরোধীদের কোনও কর্মসূচি বানচাল করার ক্ষেত্রে বা ছাত্র, শিক্ষক বা চাকরি প্রার্থীদের রাস্তায় ফেলে পেটাতে পুলিশের মেরুদণ্ড সোজাই থাকে।

> পুলিশের পিটুনি খাওয়া শুধু পুলিশের লজ্জা নয়, এ লজ্জা রাজ্যের শাসকেরও। কারণ পুলিশকে মেরুদণ্ডহীন করে তোলার পিছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী এই শাসকই।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের এমন করুণ অবস্থা হওয়ার তো কথা নয়। ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন গত ৭২ বছরে অনেকবার দুঃসময় অতিক্রম করেছে। এটা তারা করতে পেরেছে কেবলমাত্র অফিসারদের নির্ভীকতা ও আক্রমণকারীদের থেকে আক্রান্তদের রক্ষায় তাঁদের দৃঢ়চেতা ভূমিকার জন্য। তারই কয়েকটা উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে।

১। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের কলকাতা নরসংহারের দিনের একটি ঘটনা এই প্রজন্মের অফিসাররা জেনে রাখুন কাজে দেবে। ঘটনার আগে থেকে মুসলিম লিগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী (প্রিমিয়ার) সুরাবর্দি কলকাতা শহরের মুসলমান অধ্যুষিত থানাগুলিতে এমনভাবে মুসলমান অফিসারদের দিয়ে সাজিয়েছিলেন যাতে আক্রান্ত হিন্দুরা স্থানীয় পুলিশের কাছ থেকে কোনো সাহায্য না পায়। পুলিশ কমিশনার ইংরেজ হলেও ডিসি হেডকোয়ার্টার্স ছিলেন মুসলিম অফিসার সামসুদ হোদা। এন্টালি, কড়েয়া, বেনেপুকুর, খিদিরপুর এলাকার হিন্দু বাসিন্দারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণরক্ষায় ওইসব থানার পুলিশের সাহায্য পেল না। ডিসি ডিডি হীরেন সরকার ডি সি হেড কোয়ার্টার্সের ঘরে গিয়ে জানতে চাইলেন, কেন আক্রান্ত নাগরিকরা পুলিশের সাহায্য পাচ্ছে না। সেখানে কোনো সদুত্তর না পেয়ে হীরেন সরকার দুটি জিপ বোঝাই গুর্খা আর্মড পুলিশ নিয়ে খিদিরপুর চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি অগ্নিসংযোগ ও হত্যায় রত আক্রমণকারীদের 'Shoot to Kill' নির্দেশ দিয়ে অবরুদ্ধ অসহায় হিন্দুদের উদ্ধার করে ভবানীপুরে নিরাপদ অঞ্চলে স্থানান্তরিত করলেন। লালবাজারের কন্ট্রোলরুমে হীরেন সরকার ফিরে আসতেই বাংলার ক্রুদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি তাঁর মুখোমুখি। তাঁর প্রশ্ন ছিল, "বিনা নির্দেশে হীরেন সরকার কেন খিদিরপুর গিয়েছিলেন?" ততোধিক ক্রুদ্ধ হীরেনবাবু জবাব দিয়েছিলেন যে, 'পুলিশ আইনে নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় তিনি দায়বদ্ধ। সুতরাং ওই দায়িত্ব তিনি পালন

করেছেন।’

ঠিক এই একই দায়িত্ব কেন নোয়াখালিতে পুলিশ পালন করেনি, সেই প্রশ্ন করেছিলেন গান্ধীজী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে। ১৯৪৬ এর নভেম্বরে নোয়াখালির মাটিতে পা দিয়ে।

২। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বারবার প্রত্যক্ষ করেছে হিন্দু বাঙ্গালী জাতি। পুলিশের সিভিল সার্জেন্ট হিসাবে সমাজের কাছে একটা ভূমিকা, একটা দায়বদ্ধতা আছে এবং এই দায়বদ্ধতা কিন্তু আগাগোড়া ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনে নির্দিষ্ট করা আছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত থানার বড়বাবুদের স্মরণ রাখা উচিত তাঁদেরই একজন পূর্বসুরির কথা। তিনি ছিলেন মালদহ জেলার গাজোল থানার বড়বাবু মিহিরেশ বর্মন।

১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ফসলের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে গন্ডগোলের জন্য সি. পি. এম দলের কয়েকজন ভাগচাষি জমির মালিকের বাড়িতে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে দু’জন মহিলাকে ধর্ষণ করে এবং এক মহিলা সহ তিনজনকে খুন করে ওই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গাজোল থানার বড়বাবু ধর্ষণ, খুন ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেন। সি.পি.আই.এম নেতা জ্যোতি বসু তখন দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

গাজোল থানার এই ঘটনার সংবাদ পার্টি মারফত জ্যোতি বাবুর কাছে পৌঁছলে তিনি সরাসরি বড়বাবু মিহিরেশ বর্মনকে ফোন করে তাঁর দলের ধৃত ওই চারজনকে জামিনে ছেড়ে দিতে বলেন। মিহিরেশবাবু সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিবাবুকে জানিয়ে দেন, যে অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাতে আইন মোতাবেক জামিন দেওয়া যাবে না।

পরে জ্যোতিবাবু স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তদানীন্তন জয়েন্ট সেক্রেটারি মোস্তাক মুর্শেদিকে দিয়ে বড়বাবুকে নির্দেশ পাঠান যে, পুলিশ যেন আদালতে অভিযুক্তদের জামিনের আবেদনের বিরোধিতা না করে। কিন্তু বড়বাবু সেই নির্দেশটিও আইনগত কারণে তামিল করতে অস্বীকার করেন। এর কয়েকদিন পরে বড়বাবু মিহিরেশ বর্মনকে দ্রুত বদলির নির্দেশ দেন মালদহের পুলিশ সুপার। মিহিরেশবাবু বদলির নির্দেশ পেয়ে হাইকোর্টে যেতে মনস্থ করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় খবরের কাগজ মারফত খবরটি দেখে মালদহ সফরে যান এবং মিহিরেশ বাবুকে মালদহের সার্কিট হাউসে ডেকে পাঠান। অজয়বাবু ঘটনার পুরো সরকারি ফাইলটি দেখে মালদহের পুলিশ সুপারকে মিহিরেশ বাবুর বদলির আদেশ বাতিলের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিজে ওই ফাইলে সই করেন।

পরবর্তী কর্মজীবনে মিহিরেশ বর্মন সেদিন তাঁর সেই আইন মোতাবেক দৃঢ়তার জন্য সিনিয়ার অফিসারদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। এজন্য তিনি কখনই কোনও আর্থিক সুবিধা ভোগ করেননি। কেবলমাত্র একজন সিভিল সার্ভেন্ট হিসাবে সেদিন আইন মোতাবেক সমাজের কাছে তাঁর দায়বদ্ধতা পালন করেছিলেন।

৩। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে জ্যোতি বসু পুলিশমন্ত্রী থাকাকালীন রাজ্য পুলিশের শীর্ষকর্তা ছিলেন উপানন্দ বাবু। আজকের মতোই পশ্চিমবঙ্গ তখন রাজনৈতিক হানাহানিতে রক্তাক্ত। আসানসোলের কোলিয়ারিতে এক শ্রমিক নেতাকে খুনের ঘটনায় পুলিশ সি.পি.এমের কয়েকজন ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করলে ক্ষিপ্ত পুলিশমন্ত্রী জ্যোতি বাবু উপানন্দবাবুকে ডেকে প্রশ্ন করেছিলেন, কী ব্যাপার? পুলিশ আমাদের লোকজনকে ধরছে কেন? পুলিশকর্তা উপানন্দবাবু জবাবে বলেছিলেন— ‘ধৃতদের নাম এফ.আই.আর-এ আছে। পুলিশ সঠিক কাজই করেছে।’ জ্যোতিবাবু পাল্টা কোন প্রশ্ন করতে পারেননি।

পুলিশের সঙ্গে প্রশাসন সহযোগিতা করলে এবং পুলিশকে অপরাধ দমনে ব্যবস্থা নেওয়ার স্বাধীনতা দিলে অপরাধীদের শায়েস্তা করার মানসিকতা এবং যোগ্যতা অনেক পুলিশের মধ্যেই এখনও আছে।

এখানে আরও দুটি উদাহরণ তুলে ধরছি প্রশাসনিক কর্তাদের অবগতির জন্য।

১। ১৯৬১ সালে সিপি (আই) এম নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার একজন মন্ত্রী ছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে তাঁর ঘরে সাংবাদিকরা উপস্থিত থাকাকালে মেদিনীপুর থেকে সরকারি সূত্রে খবর এল, মন্ত্রীর দলের কিছু লোক ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে কিছু দাবিতে পথ অবরোধ করে বসে আছে।

হরেকৃষ্ণবাবুর মনে পাপ থাকলে তিনি পুলিশকে নিস্ক্রিয় থাকার ইঙ্গিত দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি দর্নীতিগ্রস্থ রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তাই তিনি সরাসরি হুমকি দিলেন; ‘‘আমার নাম করে ওদের বলুন, ১৫ মিনিটের মধ্যে উঠে যেতে। তার পরেও যদি ওরা অবরোধ না তোলে, পিটিয়ে তুলে দেবেন।’’

২। ১৯৭২ সালে পুলিশ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন তখনকার ছাত্র পরিষদ নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এখন যিনি পঞ্চায়েত মন্ত্রী। হাওড়া শহরের ছাত্র পরিষদের কিছু ছেলে জেলাশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য তাঁর অফিসের সামনে পথ অবরোধ করে। সুব্রতবাবু সেকথা জানতে পেরেই মহাকরণ থেকে সোজা হাওড়ায় চলে গেলেন। ছাত্র পরিষদ কর্মীদের কথা শুনে তাঁদের বক্তব্য বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের অবরোধ তুলে নিতে বলে মহাকরণে ফিরে এলেন।

সুব্রতবাবু প্রতারক ছিলেন না। তিনিও সোজা-সাপ্টা মানুষ। তাই রাইটার্সে ফিরে এসে খবর নিয়ে জানলেন, অবরোধ ওঠেনি। তখন তিনি পুলিশকে বললেন, ‘‘এবার পুলিশ যেমন করে পারে অবরোধ তুলে দিক।’’ এই দুটি ঘটনাও বুঝিয়ে দিচ্ছে, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে পুলিশেরও যোগ্যতার অভাব হয় না।

আমরা মনে করি পুলিশের পিটুনি খাওয়া শুধু পুলিশের লজ্জা নয়, এ লজ্জা শাসকেরও। কারণ পুলিশকে মেরুদণ্ডহীন করে তোলার পিছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী এই শাসকই। আমরা আশা রাখি, স্বকীয়তা বজায় রাখতে ও নিজেদের ভাবমূর্তি ফেরাতে কড়া পদক্ষেপে অটল থেকে এই লজ্জাজনক ঘটনার বিহিত করবে বর্তমান প্রশাসন। এটা শুধু রাজ্যের জন্য নয়, গোটা সমাজের জন্যই অত্যন্ত জরুরি। ■

বাঙ্গালি এখন দুর্বৃত্তের শাসনে বন্দি

বলাইচন্দ্র চক্রবর্তী

আমরা যারা গত শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগ্রামে বড়ো হয়েছি, তাদের মনে আছে পল্লীজীবনে দুঃখকষ্ট, ঝগড়াঝাঁটি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব, কৃষি, কুটির শিল্পের বিকাশের দুরবস্থা সবই ছিল—কিন্তু এতসব কিছু সত্ত্বেও গ্রামজীবনে একটা স্বাভাবিক চলন ছিল। ছিল একটা বহমান স্বতঃস্ফূর্ত গতি। অনেক খেলার মাঠ ছিল, সাঁতারের পুকুর ছিল। ছিল যাত্রা-থিয়েটার-আবৃত্তি এবং বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা ও বন্দোবস্ত। এখন পিছন ফিরে ভাবলে মনে হয়—ছিল না দুটো বিষয় ঃ 'রাজনীতি' এবং 'উন্নয়ন'। 'রাজনীতি' ব্যাপারটা এখনকার পরিচয়ে না থাকার মূল কারণটা ছিল কংগ্রেস পার্টির একাধিপত্য এবং 'উন্নয়ন' প্রসঙ্গে তাই আলোচনাও ছিল না।

একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের আধিপত্য থেকে স্বভাবতই চলে এসেছিল প্রশাসনিক জাড্য এবং ব্যর্থতা। বিধানচন্দ্র রায়ের মতো দক্ষ প্রশাসকের পরিচালনা সত্ত্বেও প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও দুর্নীতি জনগণের গোচরে আনার প্রথম সফল প্রচেষ্টা করেন বামপন্থীরাই এবং তাঁদের উদ্যোগের পিছনে ছিল দেশভাগের বলি উদ্বাস্তুদের অসহায় অবস্থার উদ্বেগ। এই উদ্যোগের প্রথম দুটি ফসল ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালের দু'দুটো যুক্তফ্রন্ট সরকার চরম ব্যর্থ হলো নেতৃবৃন্দের তাড়াহুড়ো, অনভিজ্ঞতা এবং খেয়োখেয়ির কারণে। মাঝে রাষ্ট্রপতির শাসন এবং একটা খোঁড়া সরকারের স্বল্পকালীন শাসনের পরে এল সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার—সেটা ১৯৭২ সাল। সিদ্ধার্থশঙ্কর উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত এবং দক্ষ রাজনীতিক হলেও তাঁর শাসনকাল নানান প্রশ্নচিহ্নে বাঙ্গালিজীবনকে অনেকখানিই ব্যতিব্যস্ত করেছিল। ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার আঘাতে গোটা ভারতবর্ষের সঙ্গে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারও তাই পেল নিষ্ঠুর ঘাড়ধাক্কা।

১৯৭৭-এ রাজ্যে এল এক ঝাঁক দল নিয়ে গঠিত বামফ্রন্টের সরকার—আসলে কিন্তু সিপিএম দলেরই সরকার। প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙারদের মত চতুর বামপন্থী নেতৃবৃন্দ হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন যে দুটো যুক্তফ্রন্ট আমলের অরাজকতা সম্পূর্ণ পরিহার করে নতুন পদ্ধতিতে রাজ্য শাসন করতে হবে। সেই কৌশলের মূল ভাবনাটাই ছিল ধীরেসুস্থে স্লো পয়জনিঙের ঢঙে গোটা বঙ্গসমাজকেই নতুন করে গড়ে পিঠে নবআঙ্গিকের প্রচলন।

কিন্তু অচিরেই বামপন্থীরা নখ দাঁত প্রকট করতে শুরু করল। সমাজের বুদ্ধিমান অংশ বুঝতে শুরু করল—বামপন্থার উদ্দেশ্য হলো সমাজকে মুঠোয় পোরা এবং তারপর তাকে দানাপানি খাইয়ে বেঁচেবর্তে থাকতে সাহায্য করা। অনেক প্রকৃত কৃষক চাষের জমি পেল, তৃণমূল স্তরে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হলো—কিন্তু সব কিছুই চলে এল নেতৃত্বের দৃষ্টিপাতে। বেতনভুক সরকারি কর্মচারীরা কৌটিল্যের আমল থেকেই 'ঘুষখোর' বদনামের ভাগী—কিন্তু জনগণ মনে করত থানার বড়বাবু বা ডি এম সাহেবের কেরানি পয়সা চান বটে, কিন্তু তাঁরা সকলেই নিরপেক্ষ। সেই সরকারি কর্মচারিরাই ক্রমে 'কমরেড' তকমা পেতে শুরু করলেন—সাধারণ কর্মচারী থেকে শুরু করে ছোট-সেজ-মেজ হয়ে শেষ পর্যন্ত গেরস্তারি বড় সাহেবরাও কমরেডের গোয়ালে খোঁটাবদ্ধ হলেন। এই পর্যায়ে শেষ এবং নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লালঝান্ডাধারীরা হলেন ডাক্তারবাবুরা। এই সর্বনাশা অকাজটা করতে সিপিএমকে অবশ্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তৃতীয় বামফ্রন্টের আমলে শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবাবিধির উদ্দেশ্যমূলক এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে পরিবর্তন সাধন করে তাঁদের কবজা করতে হলো। বিজয় উৎসবের ঢঙে মৌলালি যুবকেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার দুই সিপিএম মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গোড়াপত্তন হলো সরকারি ডাক্তারদের প্রথম ধামাধরা সংগঠন।

পৃথিবীর ইতিহাসই দেখিয়ে দিয়েছে কোনও জনগোষ্ঠীই বন্দি জীবনযাপনে রাজি হয় না। স্বাভাবিক নিয়মেই বঙ্গসমাজও আনল 'পরিবর্তন'। কিন্তু অচিরেই উপলব্ধি হল—পথভ্রষ্ট শাসকের পরিবর্তে এসে হাজির হয়েছে দুর্বৃত্তবাহিনী। আজকের পশ্চিমবঙ্গ যে দুর্বৃত্তবাহিনীর হাতে বন্দি তাদের নেত্রী সম্পর্কে যথাযথ পরিচিতি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তীক্ষ্ণ লেখক, অর্থনীতির সফল অধ্যাপক এবং প্রথম দিকের বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র।

বতর্মানে বাঙ্গালি এই দুর্বৃত্ত শাসনেই বন্দি। শাসনব্যবস্থার অন্য কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠী আসবে কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের গভীরে। কিন্তু বর্তমান অবস্থাতেও গ্রামবাঙ্গলায় পরিবর্তন আনা যেতে পারে কিছু সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং সভ্যতার ইতিহাসেই পেয়েছি গ্রামেই সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল। এই প্রচেষ্টাটা হতে পারে দ্বিমুখী—পল্লীজীবনের সমাজের সেই পুরোনো ছন্দকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন। কিন্তু এতসব কিছু করতে গেলে ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত কোনও সুসংবদ্ধ জনগোষ্ঠী হয়তো এমন উদ্যোগ ভবিষ্যতে গ্রহণ করবে বলে বিশ্বাস রাখাই একমাত্র সদর্থক প্রার্থনা। ■

মোদী-শাহের পরিকল্পনা রূপায়ণের মূল মস্তিষ্ক দোভাল

অভিমন্যু গুহ

অজিত দোভাল। এই নামটা বিগত পাঁচ বছরে অনেকের, বিশেষ করে সংসদীয় বিরোধীদের গাত্রদাহের কারণ হয়েছে। কারণ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদ অলংকৃত করে থাকা এই মানুষটি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন একান্ত অনুগত কর্মী, যাঁদের 'স্বয়ংসেবক' বলা হয়ে থাকে। ব্যক্তির থেকে সংগঠন বড়ো, আর সংগঠনের থেকে দেশ— আর এস এসে এই শিক্ষা যেমন দেওয়া হয়ে থাকে তেমন বিবেকানন্দের আদর্শ 'ম্যান মেকিং ইজ মাই মিশন' এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মান ও হুঁশ-সমৃদ্ধ 'মানুষ' তৈরিও সঙ্ঘের অন্যতম উদ্দেশ্য, যাঁরা দেশের সেবাকেই তাঁদের ধ্যান জ্ঞান করবেন। আর এস এসের মানুষ তৈরির কারখানাতেই পাওয়া গিয়েছিল অজিত দোভালকে। স্বাধীনতার পর থেকে যে কাশ্মীরের অশান্ত থাকাই রেওয়াজ, কাশ্মীরি যুবকদের দেশের নিরাপত্তা-বাহিনীর ওপর পাথর ছোঁড়াই যেন একমাত্র পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ৩৭০ ধারা আর ৩৫এ ধারা বিলোপের পর সেই কাশ্মীর আশ্চর্যজনক ভাবে শান্ত। এই দুই ধারার বিলোপ যে মূলস্রোতের ভারতীয় অঙ্গরাজ্য হিসাবে কাশ্মীরকে তুলে ধরেছে, তার অন্যান্য প্রমাণের চাইতে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়ার প্রমাণই সবচাইতে জোরালো প্রমাণ। নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ এই কাজে যাঁর ওপর সবচেয়ে বেশি আস্থা রেখেছিলেন, তাঁরই নাম অজিত দোভাল। যিনি দীর্ঘ এগারো দিন কাশ্মীরে ছিলেন, এমন এক পরিস্থিতিতে যখন ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বিলুপ্ত হয়েছে; ও সেই সুবাদে পাক-পন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী আর পাক-পন্থী ভারতীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ গোলমাল পাকানোর চেষ্টায় মরিয়া। এদের গৃহবন্দি করে রাখাটাও বিপজ্জনক হতে পারতো, যদি না অজিত দোভাল কুরুক্ষেত্র থুড়ি কাশ্মীর ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল না দিতেন।

এর নিট ফল কী হয়েছে শুনবেন? এর প্রত্যক্ষগোচর ফল হলো,কংগ্রেস নামক

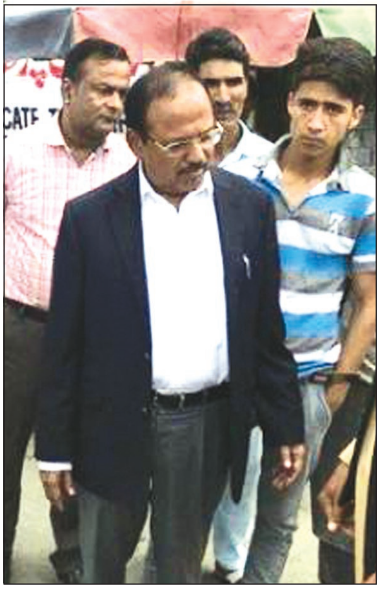

রাজনৈতিক দলের গান্ধী-প্রভুদের প্রধান বিশ্বস্ত অনুচর তথা জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবি আজাদ অসহ্য রাগে বলে ফেলেছেন পয়সা ফেললেই নাকি কাশ্মীরিদের সঙ্গে মেলামেশার দৃশ্যের ছবি তোলানো যায়। হক কথা, পয়সা ফেললে কি যে না হয় কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লা আর গোটা ভারতে জওহরলাল নেহরুর ষাট-সত্তর বছর ধরে চলা পৈতৃক জমিদারি তার প্রমাণ দিয়েছে। আসলে ৩৭০ ও ৩৫এ ধারার জন্য কাশ্মীরিরা কোনওদিনই ভারতের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। অজিত দোভাল এগারো দিন কাশ্মীরে থেকে ঠিক এই কাজটিই করেছেন। বন্ধ দোকানের সামনে তিনি কাশ্মীরিদের সঙ্গে খেয়েছেন, আড্ডা দিয়েছেন। ফলে যে দোকান বন্ধ ছিল, তা খুলে গেছে। অন্যান্যবার এই সময় ভারতবাসী ভগবানের নাম জপ করেন, অমরনাথ যাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরে আসতে পারেন। ভগবান এই ডাক খুব কমই শুনেছেন।

এবারও যে সেই চেষ্টা হয়নি তা নয়, দেশের নিরাপত্তারক্ষীরা পাক অনুপ্রবেশকারী জঙ্গিদের গুলি করে মেরেছে। নিরাপত্তা-বলয়ে কাশ্মীরকে মুড়ে ফেলা ছিল দোভালের পরিকল্পনার একটি অঙ্গ। জঙ্গিরা মাঝে মধ্যেই কাশ্মীরে মসজিদে বিস্ফোরণ ঘটাতো আর সাধারণ কাশ্মীরিদের ঘাড়ে চাপানো হতো দোষ। কাশ্মীরি পণ্ডিত বিতাড়নের সুচারু অঙ্গ ছিল জঙ্গিদের জেল থেকে মুক্তি। অজিত দোভাল বুঝেছিলেন কাশ্মীরের বাসিন্দাদের জঙ্গিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেই উপত্যকা আবার ভূ-স্বর্গ হয়ে উঠবে। জঙ্গিদের মদতে পাকিস্তান এক সময় গণভোটের দাবি তুলে ভারত-অধিকৃত কাশ্মীর-সহ গোটা কাশ্মীরই দখল করার স্বপ্ন দেখেছিল।

আজ অজিত দোভাল কাশ্মীরে এমনই পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছেন, যে কেবল ভারতে থাকা কাশ্মীরই নয়, পাক-অধিকৃত কাশ্মীরও আজ পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির দিন গুণছে। ইমরান যখন বলেন পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ভারত হাত দেওয়ার চেষ্টা করলেই 'যুদ্ধ' তখনই বোঝা যায় পাশা উলটেছে। অজিত দোভাল যে সবকিছুই একা করছেন এমন নয়। এটা আদতে একটা টিম ওয়ার্ক। যার মাথায় মোদী অমিত শাহের হাত রয়েছে। কিন্তু মাঠে নেমে যা কাজ করার তা দোভালকেই করতে হচ্ছে। তিনি দেশের মুখ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা, তাই দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে কেউ তাঁকে ছেড়ে কথা বলবে না।

কেরল ক্যাডারের আই পি এস (১৯৫৮) দোভালের অভিজ্ঞতা আছে বিচ্ছিন্নতাবাদ মোকাবিলায়, মিজো আন্দোলনের সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। শোনা যায়, পাকিস্তানে তিনি গুপ্তচরের কাজেও পটুতা দেখিয়েছিলেন। কাশ্মীরে সেই অভিজ্ঞতা তাঁর নিশ্চয়ই কাজে লেগেছে। তাই পরোক্ষ নীট ফল দেখুন টুকরে গোষ্ঠীর 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি' আর শোনা যাচ্ছে না। কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদের ধুয়ো আর উঠছে না। ঈদের দিন আকাশপথে দোভাল নজরদারি চালিয়েছিলেন, নিশ্চিন্তে কেটেছে ঈদ। মসজিদে বিস্ফোরণ, নৈব নৈব চ। তাই প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে কাশ্মীরিদের মন জয় যুদ্ধ জয় করেছেন দোভাল। সাফল্য স্বয়ংসেবকের, গর্ব দেশবাসীর।

ফলে খুব অসুবিধায় বিরোধীরা। দেশের স্বার্থ তুচ্ছ করে, বিদেশি শক্তির হাত শক্ত করতে যাদের দুর্ধর্ষ সব ভূমিকা গত পাঁচ বছরে দেখেছে দেশ, মোদী শাহের পরিকল্পনা আর দোভালের রূপায়ণে বৈদেশিক শত্রু আর ঘর শত্রু উভয়েই এখন ঠান্ডা। ■

চিঠিপত্র

এক দেশ, এক বিধান, এক নিশান

২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবাসীর ৭৩তম স্বাধীনতা দিবস উৎযাপনে আমাদের দেশ দুটি জিনিস উপহার পেয়েছে। প্রথমটি হলো— দ্বিতীয়বারের জন্য নরেন্দ্র মোদী সরকারের কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসা এবং দ্বিতীয়টি হলো জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ভেদ সৃষ্টিকারী ৩৭০ ও ৩৫এ আইন বিলোপ করে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে এক শাসনতন্ত্রে নিয়ে আসা। আর এই দুটি কৃতিত্বই দেখিয়েছেন সাহসী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর ব্রিগেডবাহিনী। মাউন্ট ব্যাটেন এবং তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এক 'ঐতিহাসিক ভুল সিদ্ধান্তের' ফলে কাশ্মীরে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করে গিয়েছিলেন তাতে বার বার খেসারত দিতে হয়েছিল বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষকে। কাশ্মীরবাসীরা কখনোই নিজেদের ভারতীয় বলে মনে করতেন না। অথচ দেশের সমস্ত সুযোগ সুবিধা তারা গ্রহণ করতেন। ক্রিকেট-সহ অন্যান্য খেলায় ভারত পরাজিত হলে তারা উৎসবে শামিল হতো। কাশ্মীরে নিযুক্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর পাথর ছুঁড়ে হামলা করা ইত্যাদি দুষ্কর্ম কাশ্মীরবাসীরা অহরহ করে থাকে। সুতরাং ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিল করে নরেন্দ্র মোদী সরকার এক সাহসী, অনন্য ও অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। আর এর ফলে কাশ্মীরের প্রভূত উন্নতি ঘটবে। জম্মু-কাশ্মীরের পণ্ডিতগণ নিজভূমে পরবাসী হবেন না। সর্বোপরি— এক দেশ, এক আইন, এক নিশান রচিত হলো।

—নরেশ মল্লিক,
পূর্বস্থলী-২, পূর্ব বর্ধমান।

চীনের মুসলমানদের জন্য কমিউনিস্টরা একটু কাঁদুন!

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের পর দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল মুখে কুলুপ এঁটে থাকলেও কিছু প্রথম শ্রেণীর কংগ্রেস নেতা এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু একমাত্র সিপিএম দল এবং তাদের লেজুর পার্টি বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ মিছিল করছে। দেশভাগ সমর্থন থেকে মুসলিম লিগের গণহত্যা, নারীধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগের মতো বর্বরোচিত কাজের সময় তারা মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিল। পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে হিন্দুরা ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েও তারা তাদের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটাননি। তাদের নিকট আমার একটি প্রশ্ন, তাদের পিতৃভূমি চীনে কয়েক লক্ষ উইঘুর মুসলমানকে কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে আটকে রেখে শুয়োরের মাংস এবং মদ্য পানে বাধ্য করা, তাদের নামাজ পড়া, দাড়ি রাখা, ইসলামি নাম রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিপিএম নেতারা তার প্রতিবাদ করে ভারতস্থ চীনা দূতাবাসগুলির সামনে কেন বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন না? অন্ততপক্ষে একটু কাঁদুন!

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

বাঙ্গলায় রাম

স্বস্তিকা পত্রিকায় ৫ শ্রাবণ, ১৪২৬, ২২ জুলাই ২০১৯, পৃ. ২৬, ড. অচিন্ত্য বিশ্বাসের 'শ্রীরামচন্দ্র ও বঙ্গ সংস্কৃতি' নিবন্ধটি খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ— ধবল ধরণী-ধলভূম অন্তর্গত মেদিনীপুর ও সিংহভূম জেলার প্রমার দেও ধবলদেবগণ ধবলা বনীনাথ রূপে তাঁদের সরকার থেকে নিমন্ত্রণপত্রে 'শ্রীশ্রী রামচন্দ্র রংকিণী (পূর্ব বানান রঙ্কিনী) চরণে শরণম্' ব্যবহার করতেন।

বরাহাবনী বরাহভূম অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের ও ঝাড়খণ্ডের (পুরুলিয়া ও সিংহভূম জেলা) ভূমিতে বরাহ বাজার (বরা বাজার) ও নিমতিহ'র রঘুনাথপুরে বরাহা বনীনাথ বৈরাটি রঘুনাথ নারায়ণ দর্প শাহাদেব শ্রীশ্রী রঘুনাথ মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। প্রথমটি ধ্বংসের পথে, দ্বিতীয়টি ধ্বংসপ্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ তথা ঝাড়খণ্ড সরকার চুপ। দ্বিতীয়টির মোহন্তরা সেবার সম্পত্তি বেচে দিয়েছেন।

শেখরভূম পঞ্চকোট প্রমার সিংহদেওগণ (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, রাঁচী, ধানবাদ জেলা) শ্রীশ্রীরঘুনাথ মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। আচকুড়া, বেড়ো, রঘুনাথপুর, আড়ড়া, গাঙ্গপুর, মঙ্গলদা, চেলিয়াসা, মণিহারা, সুতাবই, নতুন গ্রাম, আলকুশা, পঞ্চকোট পাহাড় পাদদেশে প্রমাণ রয়েছে।

শ্রীশ্রী রামচন্দ্র বনবাস শেষে অযোধ্যায় ফিরে এলে বাসিন্দারা প্রদীপ জ্বেলে আলোকসজ্জা করেছিলেন এছাড়া ভূমি লক্ষ্মী হিসেবে শ্রীশ্রী সীতাদেবীর উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রী কালিকাদেবীর পুজোর রাতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পুজো করেছিলেন ওই স্মৃতি এই অঞ্চলে পালন করা হয়ে এসেছে। এখনো হয়। ইতিহাসনিষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য ড. বিশ্বাসকে অজস্র ধন্যবাদ।

—শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহদেব,
বৈরাটি, পুরুলিয়া।

স্বাধীনতার আত্মকথা

দেখতে দেখতে আমি ৭২ বছর পেরিয়ে ৭৩-এ পা দিলাম। তোমরা জানো ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্টের এক চরম দোদুল্যমান ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণে আমি 'নবভগ্নবিকৃত'-রূপে ভূমিষ্ঠ হলাম। মুক্ত হলাম ৮০০ বছরের মুসলমান শাসন, ২০০ বছরের ইংরেজ শাসনের দাসত্ব থেকে। আমি স্বাধীনতা লাভ করলাম দূষিত কলুষিত দাঙ্গাজর্জরিত ধান্দাবাজ রাজনীতির পরিবেশে যেখানে আমি দুদণ্ড বুকভরে শ্বাস নিতেও পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম না আমার আয়ুই বা আর কতদিন! বেশ কয়েক বছর হামাগুড়ি দিতে না দিতেই আমারই আত্মজার চোখ রাঙ্গানী-সহ শাসানি। সে আমার আমার ঘাড়ে উঠে মাথার দিকে হাত বাড়াতে যায়। ফলস্বরূপ পুরোপুরি দাঁড়াতে শেখার আগেই সংঘর্ষ। কিন্তু তখনও খেয়াল করিনি আমার অন্তরের মধ্যে আমার সঙ্গেই বেড়ে উঠছে আরও একটি পরজীবী! বাইরের অনাবশ্যক অনভিপ্রেত অবশ্যম্ভাবী ঝড়-ঝাপটা

সামলাতে গিয়ে একদম বুঝতেই পারিনি, চিনতেই পারিনি এই 'আত্মজা'কে। এই অচেনা অজানা পরজীবীর সৃষ্টি আমার নবরূপে ভূমিষ্ঠ কালীনই; যাকে উপলব্ধি করতে আমার সময় লেগে গেল বহু বছর। ওই পরজীবী আজকে আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে; রক্তের কণায় কণায় মারণ থাবা দিয়েছে। ৭২ বছর ধরে আমার সারা শরীরের সর্বত্র চাড়িয়ে দিয়েছে শিকড়-শাখা-প্রশাখা। ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারছি আমি আবার পরাধীনতার নাগপাশে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়েছি। এখন আমি আমার নবজন্মের পূর্বের মতোই আবার শোষিতা, ধর্ষিতা, পদদলিতা। এবার আমাকে মুক্তি দেবে কে? আমার সেই যমজরূপী অন্তর্জাত শত্রুকেও করেছি চিহ্নিত। সেই মূর্তিমান হলো আর কেউ নয়, আমার-আপনার অতি সুপরিচিত, যাকে নিয়ে অহরহ, সময়ে-অসময়ে আলোচনা-সমালোচনা-- সে হলো 'দুর্নীতি'। এখন আমার রক্তে-রক্তে, মজ্জায়- মজ্জায় রয়েছে দুর্নীতির বিষবাষ্প। কিন্তু তার থেকে স্বাধীনতা অর্জন করবই বা কীভাবে। আমাকে স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছিল যে অঙ্গ— সে বঙ্গ, যে বঙ্গ ছিল আমার সন্তানদের বিপ্লবের আঁতুড়ঘর, যে বঙ্গ ছিল আমার অন্যান্য অঙ্গের অনুসরণীয়, অনুকরণীয়, পথ প্রদর্শক, মেরুদণ্ডহীন সে বঙ্গই আজ শয্যাশায়ী— ঘুমন্ত, আফিমের নেশাগ্রস্ত! সেই বঙ্গকে আজ খাইয়ে-গিলিয়ে-পরিয়ে দিতে হয়। যতই খাওয়াই না কেন— তবুও তার হয় না যে বদহজম! (বদহজম হলে নয় তাও একটু উঠে দাঁড়াত!) কিন্তু জাগাবই বা কীভাবে একটুও বুঝে উঠতে পারছি না! তাহলে কি আমাকে আবার সেই পরাধীনতার শৃঙ্খলের ঘানি টেনে যেতে হবে! তাহলে কি আমার মাত্র ৭১ বছরের মুক্ত জীবন দুর্নীতির করাল গ্রাসে, অমানিশার আঁধারে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হয়ে যাবে! তাহলে কি আমার পক্ষে আর কখনও 'জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন' লাভ করা সম্ভব হবে না, সেটা 'অলীক সুখ'-এর মতোই আমার হৃদয়ে রয়ে থাকবে! তাহলে কি আমার শরীরে ক্যান্সার রূপী দুর্নীতির পদতলে নিজেকে তিল তিল করে দগ্ধে দগ্ধে ঝাঁঝরা হয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার দিন গুনতে হবে! তাহলে প্রাণপ্রিয় যে সন্তানদের আত্ম বলিদানে আমার মধ্যে নব প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল তা কি আস্তে আস্তে ব্যর্থ হয়ে যাবে! কে দেবে এর জবাব! কে করবে আমায় দুর্নীতির পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্তি! কোথায় গেল 'ওরে আমার নবীন ওরে আমার কাঁচা'— যারা এই দুর্নীতিগ্রস্ত 'আধমরাদের হাত' থেকে আমাকে বাঁচাবে! কোথায় আমার 'ছাত্রদল'; কোথায় আমার 'আঠারো বছর বয়স'-এর সন্তান, যারা নিজ মায়ের স্বাধীনতা-সম্ভ্রম রক্ষায় গর্জে উঠবে; ভেঙে ফেলবে দুর্নীতির ওই 'লৌহ কপাট'! আর কত প্রহর গুনবে তাদের দেশমাতৃকা! তাঁদের মা শুধুই এসব বসে বসে ভাবে সারাদিন, কী করে কাটাবে আজকের এই জন্মদিন!

—সৌম্যজ্যোতি মাইতি,
সিঙ্গুর, হুগলি।

৩৭০ ধারা বাতিলে পাকিস্তানের নাক গলানো

৩৭০ ধারা বাতিল হওয়াতে পাকিস্তান খুবই আঘাত পেয়েছে। কারণ যারা নিজের দেশকে সামলাতে পারে না তাদের মুখে আবার বড়ো বড়ো কথা। আমাদের দেশের অনেক জ্ঞানী-গুণী একটা কথা ভেবে পাচ্ছেন না, ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পাকিস্তানের আগবাড়িয়ে এত নাক গলানো কেন? হয়তো পাকিস্তান বলবে কাশ্মীরে মুসলমান বেশি আছে। তাহলে তো ভারতের অনেক রাজ্যে কম বেশি মুসলমান আছে। সেগুলিও তো পাকিস্তানকে ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু পাকিস্তানের অন্য দেশের ওপর এত মাতব্বরি কেন? হয়তো ভাবছেন ওরা মুসলমান তাই মুসলমানদের উপর এত দরদ। তাহলে তো আফগানিস্তানকেও পাকিস্তানের সঙ্গে শামিল করতে হয়। কারণ ওরাও তো মুসলমান।

ওদিকে পাশেই আছে আরব, ইরান, ওমান। তাদের জন্য পাকিস্তানের একটা দায়িত্ব আছে। একেই বলে নেই কাজ তো খই বাছ। লোকসভায় ৩৬৬ ভোটে ৩৭০ ধারা পাশ হয়েছে। রাজ্যসভায় ১২৫ ভোটে। অপরপক্ষে বিরোধী ভোট পেয়েছে লোকসভায় ৬৬ আর রাজ্যসভায় ৬৯টি।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর।

বর্ধমান থাক বর্ধমানেই

অতি সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ, বর্ধমান রেল স্টেশানের নাম স্বাধীনতা সংগ্রামী বটুকেশ্বর দত্তের নামে করতে চায় রেল কর্তৃপক্ষ। অতি নগণ্য ইতিহাস প্রেমিক হিসেবে রেল কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপের কড়া নিন্দা করছি। ভারত সরকার বর্ধমান শহরে দশ হাজার হাত উঁচু বটুকেশ্বর দত্তের কনক মূর্তি স্থাপন করুক, আপত্তি নেই। কিন্তু স্থান নামের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই এমন নাম রাখা কী উচিত? তাছাড়া, এই স্টেশনকে কেন্দ্র করে কত লেখকের যে কত লেখা আছে তার হিসাব কি রেলে কর্তৃপক্ষের জানা আছে?

বর্তমান বর্ধমান শহরের কিছু দূরেই আছে 'অস্থিক' গ্রাম। শোনা যায় মহাবীর বর্ধনের পবিত্র অস্থি এই এখানেই রাখা ছিল এবং শহরটির অতীত নাম জানা না গেলেও পরে মহাবীর বর্ধনের নামেই নাম হয় বর্ধমান। কিন্তু হিংসুটে দামোদর এই শহরটি নষ্ট করে দিলে সুরথ রাজার আমলে রাজধানী চলে যায় কোলাগ্রামে। মনেন্দারের কালে গ্রিক যবনেরা কোলা অধিকার করে নাম দেয় 'পার্থিয়া'। কালে এই নগরও ধ্বংস হয়ে গেলে বর্তমান স্থানে শহর স্থাপিত হয় এবং নাম হয় বর্ধমান। আকবর বাদশাহের আমলে বর্ধমানের নাম হয় 'শরিফাবাদ'। পরে তাজমহলের ভূ-খণ্ডের বিনিময়ে শাহজাহান এই শরিফাবাদের পাট্টা পাঠিয়ে ছিলেন জয়পুর রাজাদের নিকটে। দেখা যাচ্ছে, বর্ধমান বর্ধমানেই আছে 'শরিফাবাদ' নামটি গ্রাহ্যই করেনি আমজনতা। তাই, জনগণকে বিরক্ত না করে রেল কর্তৃপক্ষ আর অগ্রসর না হলেই মঙ্গল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছাড়পত্র দিলেও পশ্চিমবঙ্গের জনতা ছাড়পত্র দেবে কি? চন্দরনগরের মতিলাল রায় বিপ্লবী হিসেবে কম যান কীসে? তার বেলায় রেল কর্তৃপক্ষ কথা কইছে না কেন?

—মৃণাল হোড়,
চন্দরনগর, হুগলী।

পুজোর নোন্‌তা-মিস্টি খাবার

সুতপা বসাক ভড়

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে আবার পুজো এসে গেল। পুজোতে আমরা কেনাকাটা ভালোই করে থাকি। খাওয়া-দাওয়াতেও খরচ কম নয়, অথচ ওই সময় অখাদ্য-কুখাদ্য সবকিছুই বাজার থেকে কিনে এনে খেয়ে শরীর খারাপ করে বসে থাকি। এরপর চলে ওষুধ খেয়ে সুস্থ হবার পালা। এ প্রসঙ্গে জানাই, যেসব খাদ্যবস্তু আমরা ওইসময় বাজার থেকে কিনে এনে শরীর ও পয়সা দুই-ই নষ্ট করি, সেগুলি অতি সহজে বাড়িতে বসে কম খরচে, কম পরিশ্রমে বানাতে পারি। এর মধ্যে কিছু খাবার দশ থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত ভালোভাবে থাকে।

কুচো নিম্‌কি : একটি ঘরোয়া খাবার। আগে বাড়িতে বানানো হতো এবং বিজয়া দশমীতে অবশ্যই দেওয়া হতো। এর জন্য প্রয়োজন ময়দা, নুন, জোয়ান, কালোজিরে, ঘি ও সাদা তেল। প্রথমে ময়দা চেলে একটা বড়ো ডেক্‌চিতে নিতে হবে। এতে সামান্য নুন, জোয়ান, কালোজিরে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর ঘি সামান্য গরম করে ময়দায় মিশিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে মাখতে হবে। চেষ্টা করতে হবে, যাতে হাতের তালুর চাপে বল তৈরি হয়, যেন ভেঙে না যায়। এজন্য অল্প অল্প করে ঘি ময়দাতে মেশাতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বল তৈরি হচ্ছে। এরপর খুব সামান্য জলে শক্ত করে ময়দা মেখে ভিজে কাপড়ে ১০ মিনিট ঢেকে রেখে লেচি কেটে বেলুন-চাকির সাহায্যে পাতলা রুটির মতো বেলতে হবে। এবার ছুরি দিয়ে নিম্‌কির আকারে কেটে নিতে হবে। গ্যাসে কড়াই বসান। সাদা তেল অনেক বেশি গরম করে, আঁচ কমিয়ে তার মধ্যে নিম্‌কির আকারে ময়দার টুকরো ছাড়তে হবে। আঁচ খুব কম হবে এবং মাঝে মাঝে খুন্তি দিয়ে নেড়ে দিতে হবে, যাতে ভালোভাবে ভাজা হয়। হালকা কমলা রং হলে একটা নিম্‌কি তুলে ভেঙে দেখুন। হয়ে গেলে পেপার-ন্যাপকিন বেছানো বড়ো ছড়ানো বাসনে রাখতে থাকুন। ঠাণ্ডা হলে মুখবন্ধ কৌটোতে ভরে নিলেই হবে। দশদিন পর্যন্ত ভালোভাবে থাকবে। **তেকোনা নিম্‌কি** বানাতে হলে ওই ময়দামাখা থেকে ছোটো ছোটো লেচি কেটে লুচির মতো গোল করে বেলতে হবে। বেলা হলে তার ওপর সামান্য তেল লাগিয়ে ভাঁজ করে, আবার একটু তেল লাগিয়ে আর একবার ভাঁজ করে নিলেই তেকোনা নিম্‌কি ভাজার জন্য তৈরি। একদম কম আঁচে ভেজে তুলে নিলেই তৈরি তেকোনা নিম্‌কি। কুচো নিম্‌কির মতো ঠাণ্ডা হলে মুখবন্ধ কৌটাতে তুলে রাখুন। তৈরি দু-রকমের নিম্‌কি।

জিভেগজা : নাম শুনলেই জিভে জল এসে যায়। এর জন্য প্রয়োজন সামান্য নুন, চিনি, বড়ো এলাচের দানা, ঘি, সাদা তেল ও ময়দা। একটা ডেকচিতে ময়দা, এক চিমটে নুন, বড়ো এলাচের দানা (একটু থেঁতো করে) মিশিয়ে নিমকির মতো করে মাখতে হবে। ভেজা কাপড়ে ১০ মিনিট ঢেকে ছোটো ছোটো লেচি কেটে নিতে হবে। লেচিগুলো জিভের আকারে বেলতে হবে। এরপর জিভের আকার বা লম্বা জিভের আকারের ময়দার বেলাতে ছুরি দিয়ে ২-৩টে লম্বালম্বি চিড়ে নিতে হবে। এর ফলে ওগুলো তেলে ছাড়লে লুচির মতো ফুলে উঠবে না, অথচ মুচমুচে ভাজা হবে। একদম কম আঁচে উলটেপালটে ভেজে তুলে ঠাণ্ডা হতে দিন। অপর একটি কড়াইতে তিনভাগ চিনি-একভাগ জল ফুটিয়ে একতারের গাঢ় রস বানিয়ে তাতে ভাজা জিভে গজাগুলো একবার ডুবিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তুলে থালায় ছড়িয়ে শুকোতে দিতে হবে। পনেরো মিনিটের মধ্যে রস শুকিয়ে ঠনঠন আওয়াজ হবে। জিভেগজা তৈরি। মুখবন্ধ কৌটোতে ১ মাস পর্যন্ত ভালো থাকবে। সুতরাং পুজোর আগেও বানিয়ে রেখে দিতে পারেন। নিজেদের খাওয়া এবং অতিথি আপ্যায়নের জন্য খুবই উপযুক্ত।

লবঙ্গলতিকা : দুধের ক্ষীর বানিয়ে তাতে সামান্য সুজি, নারকেল কোরা, এলাচ, চিনি দিয়ে ফুটিয়ে শুকনো করে এর মধ্যে কিশমিশ, ভাঙা কাজুর টুকরো মিশিয়ে মেখে রাখতে হবে। জিভেগজার মতো ময়দা মেখে ছোটো লেচি কেটে লুচির মতো বেলে ছুরি দিয়ে অর্ধেক করে সিঙাড়ার আকারে চোঙ বানিয়ে এর মধ্যে ক্ষীরের পুর ভরে ভালো করে মুখবন্ধ করে সাদা তেলে ভেজে তুলতে হবে। গাঢ় রসে খানিকক্ষণ ডুবিয়ে তুলে নিতে হবে। ফ্রিজে ১৫-২০ দিন পর্যন্ত খুব ভালোভাবে থাকবে। দুটি নোন্‌তা এবং দুটি মিষ্টি বানাতে সময়, অর্থ ও পরিশ্রম খুব বেশি লাগে না। এর জন্য প্রয়োজন আন্তরিক প্রচেষ্টা। প্রথমে আড়াইশো গ্রাম ময়দা দিয়ে বানিয়ে দেখুন। বাচ্চাদের সাহায্য নিন। ওরা সানন্দে এগিয়ে আসবে। ঘরোয়া রান্না ওইভাবে বর্তমান থেকে আগামী প্রজন্মে যাবে— এর দায়িত্ব আমাদের মহিলাদের। ছুটির দিনে অনায়াসে একটু চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রিয়জনের কাছে হারিয়ে যেতে বসা অথচ চিরপরিচিত পদগুলি তুলে ধরতে পারবেন। এর মধ্যে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তা হৃদয় ভরে দেয়। ■

ডেঙ্গু জ্বরে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা

ডাঃ সমরজিৎ কর

জ্বর যে কি ভয়ংকর তা 'পথের পাঁচালী', 'পোস্ট মাস্টার' এসব ছবিতে পাওয়া যায়। দৃশ্যগুলি বড়োই করুণ। বর্তমানে ডেঙ্গুতে তেমনই করুণ দৃশ্য চোখে পড়ে। এ রোগ গরিব-বড়োলোক মানে না।

ডেঙ্গু একটি ভাইরাস ঘটিত সলফ্ লিমিটেড ফেব্রাইল (জ্বর হিসাবে প্রকাশ পায়) অসুখ। এডিস মশা এই ভাইরাস বহন করে। সংক্রমণের পরে রোগ লক্ষণ সামান্য থেকে মাঝারি জ্বর, রক্তক্ষরণ এমনকী শক পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে লক্ষণ অনুযায়ী টিবি, হাম, পক্স, ডেঙ্গু, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া এসব রোগের ও তার চিকিৎসার বিশদ বিবরণ আছে। কিন্তু সেই রোগগুলির বর্তমান নাম ও রোগগুলির জন্য দায়ী জীবাণুর উল্লেখ পাওয়া যায় ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে। ১৯২৬ সালে ড. গণনাথ সেনের লেখা 'সিদ্ধান্ত নিদান' এমনই একটি বই। তাই বলা হয়— "Syndrome do not change but its nomenclature varies from country to country."

আয়ুর্বেদ মতে ডেঙ্গু যদি বর্ষাকালে হয় তবে এটি একটি প্রাকৃত জ্বর। এই রোগে জ্বর থেকে রক্তক্ষরণ অর্থাৎ একটি রোগ থেকে অন্য একটি রোগ হয়। তাই একে নিদানার্থকর ব্যাধি বলে। আয়ুর্বেদ গ্রন্থে পিত্তজ জ্বর, সতত জ্বর, রক্তধাতুগত জ্বর, রক্তপিত্ত এগুলির লক্ষণ ও চিকিৎসা ডেঙ্গুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সপ্তম শতকে লেখা অষ্টাঙ্গহৃদয় নামক আয়ুর্বেদ গ্রন্থে (নিদান স্থান ২/২৯-২০) পিত্তজ্বর এর উপসর্গ হিসাবে রক্তষ্ঠীবন ও রক্ত কোঠদ্রম এই দুটি লক্ষণের কথা বলা আছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের রক্তবমি ও রক্তক্ষরণ জন্য চামড়ার নীচে লাল স্পটকে বোঝায়।

এই সব রোগে যুগ যুগ ধরে ব্যবহৃত আয়ুর্বেদের বহু উৎকৃষ্ট মানের শাস্ত্রীয় ওষুধ আছে। যেমন— সড়ঙ্গ পানীয়, দ্রাক্ষাদি কষায়, সুদর্শন ঘনবটি, গুড়ুচ্যাদি, বাসা ও দূর্বা পুটপাক (নির্যাস), অমৃতারিষ্ট ইত্যাদি। আধুনিক পেটেন্ট ওষুধগুলির রিসার্চ এবং ট্রায়াল রিপোর্ট আছে। রোগটি যেহেতু খুবই সিরিয়াস তাই কোনও ওষুধই আয়ুর্বেদ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না। ডেঙ্গু জ্বলে রক্তক্ষরণ বা শক হচ্ছে কিনা তার নিয়মিত মনিটরিং দরকার। তাই সব রোগী আউটডোর বিভাগে চিকিৎসার উপযুক্ত নয়। হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দরকার হতে পারে। এর জন্য সব চিকিৎসা বিভাগের মধ্যে সমন্বয় থাকা দরকার। আলোপ্যাথিতে যেমন প্যারাসেটামল ছাড়া অন্য কোনও ব্যথার (NSAID) ওষুধ ডেঙ্গুতে বারণ তেমনই আয়ুর্বেদে যেসব ওষুধ ও ভেষজ সর্দি জ্বরে ব্যবহার হয় কিন্তু পিত্তবর্ধক তা কোনোভাবেই ডেঙ্গুতে নিরাপদ নয়।

তবে ডেঙ্গু জ্বরে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। যেমন প্রাইভেট চেম্বারে কোনও আয়ুর্বেদ ডাক্তারবাবু যদি ওষুধ লেখেন তবে তা তথাকথিত আয়ুর্বেদ স্টোরে পাওয়া মুশকিল, কারণ বেশিরভাগ স্টোরে আয়ুর্বেদের নামে বাসন মাজার সাবান, হরেক রকম প্রসাধন সামগ্রী, জোশ বর্ধক ক্যাপ্সুল, মুখশুদ্ধি, ওটিসি প্রোডাক্ট এসবে ঠাসা থাকে, কিন্তু এথিক্যাল মেডিসিন বাড়ন্ত। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ির লোক সেখানে গিয়ে সড়ঙ্গ পানীয় চাইলে দোকানদার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে। এসব স্টোরে বাধ্যতামূলক একজন ডিগ্রিধারী আয়ুর্বেদ চিকিৎসক এবং বেশিকরে এথিক্যাল মেডিসিন রাখার ব্যবস্থা হলে ভালো হয়। তবে সরকারি আয়ুর্বেদ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতেও লক্ষ্মীবিলাস জাতীয় জ্বরের কয়েকটি ওষুধ থাকে কিন্তু অনেক সময় তা ডেঙ্গু মোকাবিলায় যথেষ্ট নয়। সরকারি ও প্রাইভেট আয়ুর্বেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলিতে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান বা ওই জাতীয় দামি আয়ুর্বেদ ওষুধের বন্দোবস্ত থাকা খুব দরকার। মোটকথা ওষুধ যেন খাঁটি হয় এবং গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র সহজলভ্য হয়।

ছোটো শিশুরা গুঁড়ো বা ট্যাবলেট খেতে পারবে না, শাস্ত্রে উল্লিখিত বহুকল্প (Various forms) মেনে সুস্বাদু সিরাপ বা ড্রপ সাপ্লাই থাকা দরকার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তামিলনাড়ুতে অতিতে বন্যায় ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার প্রকোপের সময় নিলাবেম্বু কষায় নামে একটি শাস্ত্রীয় ওষুধ প্রায় ৩২ লক্ষ মানুষকে বিতরণ করা হয় যা বহু মানুষের প্রাণ বাঁচায়। আয়ুর্বেদের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গেও ডেঙ্গু মোকাবিলায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হওয়া দরকার। ▮

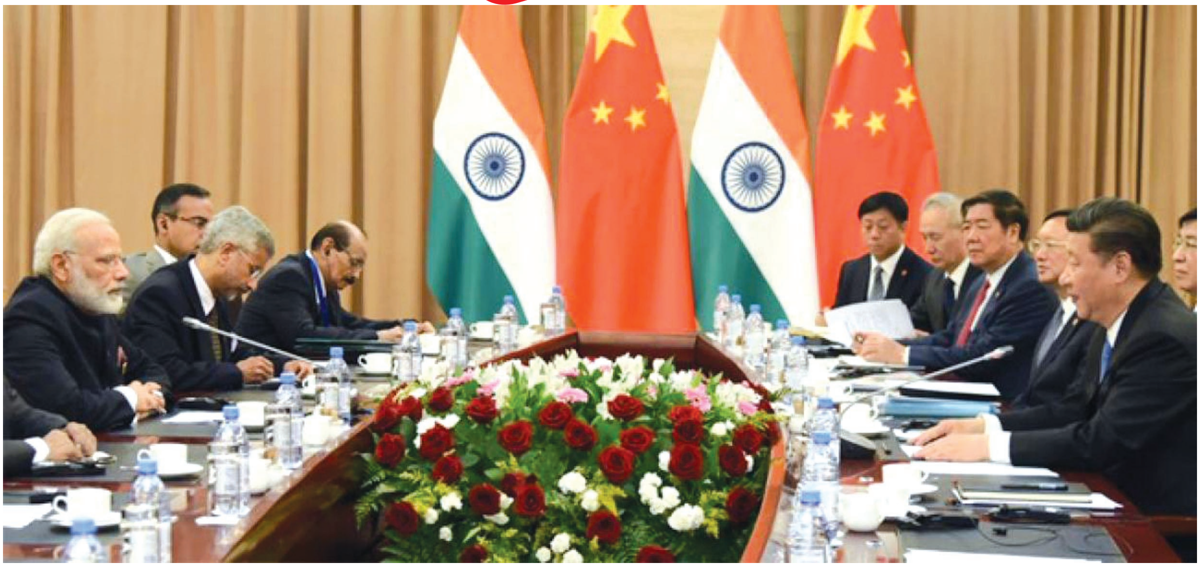

সাফল্য ভারতের বিদেশ নীতির, জয় ভারতের কূটনীতির

বিমল শঙ্কর নন্দ

আন্তর্জাতিক সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক হিসাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে নানা ধরনের সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই উদ্দেশ্য থাকে অন্য রাষ্ট্রের কার্যকলাপ বা আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এ এক অনিবার্য প্রক্রিয়া। আন্তর্জাতিক সমাজ গড়ে ওঠে প্রধানত স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক কিংবা আঞ্চলিক সংগঠনগুলিও আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ একক এবং কারক (ভূমিকা পালনকারী) হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক এবং তাদের মধ্যে চলতে থাকা বিরতিহীন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এখনো আন্তর্জাতিক রাজনীতির মুখ্য বিষয়। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় সুবিধাজনক অবস্থায় সেই থাকে সে বহির্বিশ্বকে তার ভাবনা বোঝাতে সক্ষম হয়। নিজের দেশের জাতীয় স্বার্থকে সবচেয়ে ভালোভাবে রক্ষা করতে সক্ষম হয় সেই দেশ।

গত ৫ আগস্ট, ২০১৯ গোটা দেশকে সচকিত করে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিল তাতে কেবল এদেশের মানুষ নয়, অবাক হয়েছিল গোটা বিশ্বের মানুষ যারা বিশ্বরাজনীতির গতিপ্রকৃতির খবর রাখেন। ভারতের উত্তর প্রান্তের জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিগত শতাব্দীর ৫০-এর দশকের শুরু থেকেই যে বিশেষ সুবিধা সম্বলিত ৩৭০ নম্বর ধারাটি একটি 'অস্থায়ী' এবং 'পরিবর্তনশীল' বিধিসম্বলিত ব্যবস্থা হয়েও প্রায় ৭ দশক বহাল তবিয়তে বিরাজমান ছিল কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের রাষ্ট্রপতির এক নির্দেশের মাধ্যমে তাকে রদ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। একই সঙ্গে ওই রাজ্যকে জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ এই দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ভাবে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের এনডিএ সরকার কাশ্মীর সমস্যার এক স্থায়ী সমাধানে উদ্যোগী হন। ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীরের তৎকালীন রাজা হরি সিংহ পাকিস্তান থেকে আগত হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে না পেরে ভারতের সঙ্গে Instrument of Accession of Jammu and Kashmir State to the Union of India নামক দলিলটিতে স্বাক্ষর করেন। আর শেখ আবদুল্লার আবদার মেনে ৫০-এর দশকের শুরু থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিশেষ অধিকার-সম্পর্কিত ৩৭০ ধারা ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রায় ৭ দশক ধরে চলে আসা একটি ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট।

কাশ্মীর একান্তই ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়। কারণ জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে --- বিশেষত ১৯৯০-৯১-এর পরবর্তী ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রীয় সীমানা ও তার অলঙ্ঘনীয়তার ভাবনা ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে। রাষ্ট্রের বহু আভ্যন্তরীণ বিষয়ও এখন আন্তর্জাতিক স্তরে গুরুত্ব পেয়ে যায়, আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে রাষ্ট্রকে বিশেষ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এমনিতে দক্ষিণ এশিয়া হলো আন্তর্জাতিক রাজনীতির 'উষ্ণশয্যা'। তারপর কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তান একাধিকবার যুদ্ধে লিপ্ত

হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার নজর কাশ্মীরের ঘটনাপ্রবাহের দিকে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আর পাকিস্তানের সরকারি নীতিই হলো জম্মু ও কাশ্মীরের বিষয়টির আন্তর্জাতিকীকরণ। ফলে ৩৭০ ধারা বিলোপের মতো সাহসী এবং যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে বিশেষ কূটনৈতিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাও নিতে হয়েছিল। ৩৭০ ধারা বিলোপের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এবং ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য এটাই প্রমাণ করে যে আন্তর্জাতিক দুনিয়া ভারতকে এখন যথেষ্ট পরিমাণে সমীহ করে একটি প্রভাবশালী ও শক্তিশালী দেশ হিসাবে।

৩৭০ ধারার অবলুপ্তি ঘটালে এর প্রভাব পড়বে পাকিস্তানের উপর এবং পাকিস্তান বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক দরবারে নিয়ে হাজির করবে এটা বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের বিদেশনীতি নির্ধারণের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন। তাই ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র যথা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন— এই পাঁচটি দেশকেই ওয়াকিবহাল করে ভারত। এই দেশগুলিকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেওয়া হয় বিষয়টি একান্তভাবেই ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় এবং ভারতীয় সংসদই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। এখানে আন্তর্জাতিক আইন ভাঙার মতো কোনো ঘটনাও ঘটেনি। ভারতের এই কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ৩৭০ ধারা বিলোপের পর পাকিস্তান বাদ দিয়ে অন্য কোনো দেশ কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেয়নি। এমনকী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প যিনি এর আগে একাধিকবার কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে মধ্যস্থতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তিনিও এ ব্যাপারে কোনো মতামত দেননি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস দু'দেশকেই সংযত হওয়ার আবেদন জানান।

৩৭০ ধারা প্রত্যাহার নিয়ে পৃথিবীর কোনো দেশ তেমন উচ্চবাচ্য না করলেও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া পরিচিত ছকেই এগিয়েছে। ১৯৪৭-এর ২২ অক্টোবর থেকেই পাকিস্তানের লক্ষ্য কাশ্মীরকে তার অঙ্গীভূত করা। ১৯৪৭-এর ২২ অক্টোবর একদল প্রশিক্ষিত মুজাহিদ তার সঙ্গে কিছু স্থানীয় মিলিশিয়া বাহিনীর সদস্যরা মিলে কাশ্মীর দখলের জন্য হামলা শুরু করে।

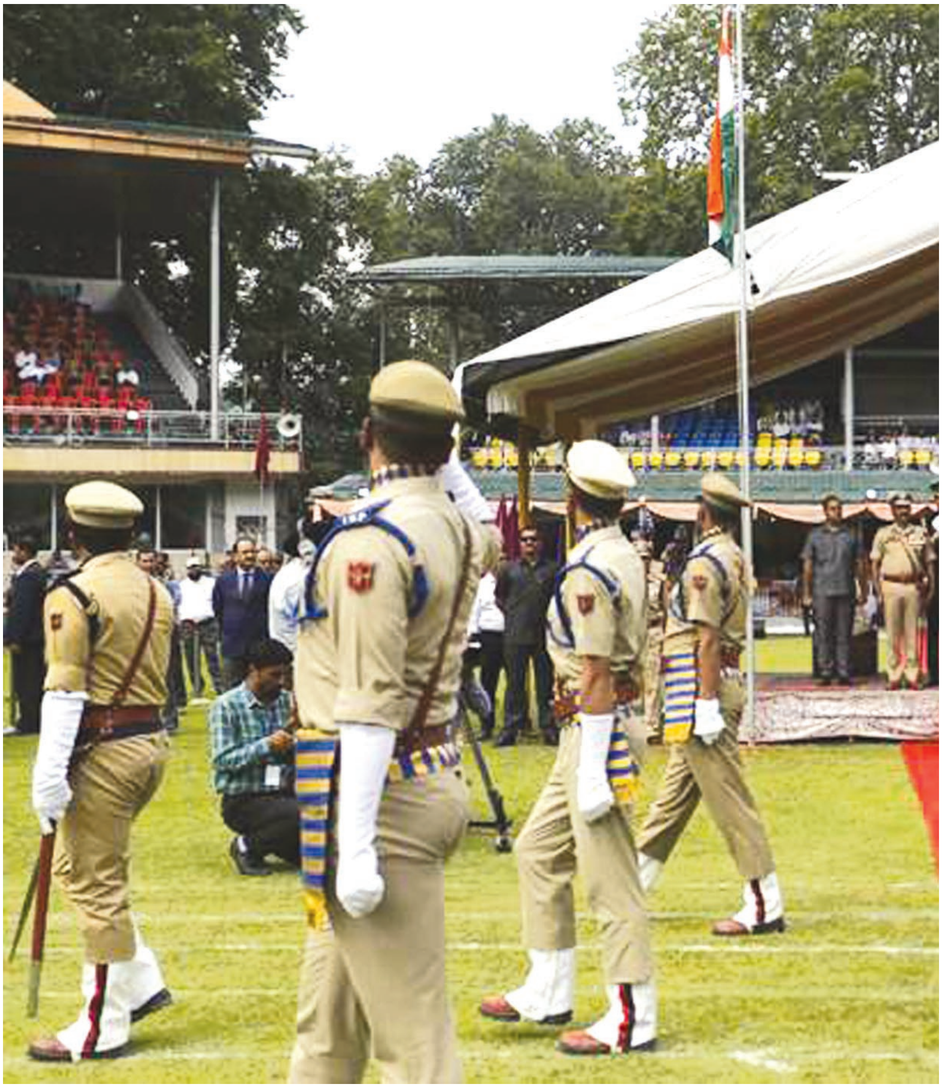

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পর্বত প্রমাণ ভুলের জন্য এখনো কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশের বেশি এলাকা পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে আছে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর নামে। তার পর থেকে পাকিস্তানের প্রধান লক্ষ্য কাশ্মীরের বাকি অংশকে নিজের অঙ্গীভূত করা। ফলে ৩৭০ ধারার বিলোপসাধন করে কাশ্মীরকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মূল স্রোতে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা পাকিস্তানের পছন্দ হবে না এটাই স্বাভাবিক। স্বভাবতই ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৩৭০ ধারা খারিজ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসনিক বিভাজনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেই পাকিস্তান তার তীব্র নিন্দা করে। পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার অজয় বিসারিয়াকে ডেকে পাঠিয়ে কড়া প্রতিবাদ পত্র দেয় পাক সরকার। শুধু তাই নয়, পাক বিদেশমন্ত্রক বিবৃতি দেয় যে ভারতের 'বেআইনি' ও 'একতরফা' সিদ্ধান্তের মোকাবিলায় তারা সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরেশি জানান ভারতের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে অভিযোগ জানাবে, অভিযোগ জানাবে মুসলমান দেশগুলির সংগঠন Organisation of Islamic Countries (IOC)-এর কাছেও। এরপর পাকিস্তান কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি পরিচিত পথ ধরেই এগিয়েছে। এগুলি হলো ভারত-পাকিস্তান কূটনৈতিক সম্পর্ককে হাইকমিশনারের নীচের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া, ভারতীয় হাইকমিশনারকে পাকিস্তান ছেড়ে যেতে বলা, ভারতীয় বিমানের জন্য পাকিস্তানের আকাশসীমা আংশিক ভাবে নিষিদ্ধ করা, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বন্ধ করে দেওয়া, পাকিস্তানে ভারতীয় সিনেমার প্রদর্শন বন্ধ করা, ভারত-পাকিস্তানের সংযোগ রক্ষাকারী সমঝোতা এক্সপ্রেস বন্ধ করা প্রভৃতি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মালিহা লোধি জাতিপুঞ্জের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি জোয়ানা রোনেকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিশেষত তার নিরাপত্তা পরিষদকে তাদের ভূমিকা পালনের

অনুরোধ জানান।

কিন্তু পাকিস্তানের কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। পৃথিবীর কোনো গুরুত্বপূর্ণ দেশই পাকিস্তানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কাশ্মীরে গৃহীত ভারত সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে রাজি হয়নি। সকলেরই মত এটি ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় এবং ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সমস্যা থাকলে তা দু' দেশকেই মেটাতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ House Foreign Affairs Committee-এর চেয়ারম্যান ইলিয়ট এঞ্জেল এবং সেনেটার বব মেনেনডেজ একটি বিবৃতিতে পাকিস্তানকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে কোনোরকম আগ্রাসী কার্যকলাপ না করতে বলেন এবং এ ব্যাপারে কড়া হুঁশিয়ারি দেন। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের মধ্যে গড়ে ওঠা সন্ত্রাসী কাঠামোর বিরুদ্ধে সে দেশকেই কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে এই দাবিও করেন একাধিক মার্কিন রাজনীতিক। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান যে আন্তর্জাতিক দুনিয়াকে পাশে পায়নি তা স্বীকার করে নিয়েছেন পাক বিদেশমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরেশি। আন্তর্জাতিক দুনিয়ার প্রতিক্রিয়ায় তিনি স্পষ্টতই হতাশা ব্যক্ত করেছেন।

পাকিস্তানের সান্ত্বনা পুরস্কার ছিল তাদের আন্তর্জাতিক মুরুব্বি চীনের উদ্যোগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধে চীন পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের লাদাখ এলাকার ১৪৩৮০ বর্গমাইল এলাকা বেআইনিভাবে দখল করে নেয় এবং এই আকসাই চীন অঞ্চল এখনো চীনের বেআইনি দখলে আছে। উপরন্তু পাকিস্তান হলো ভারতের বিরুদ্ধে চীনের কার্যকলাপের অন্যতম মদতদাতা। ফলে পাকিস্তানকে খুশি রাখতে চীনকে নিরাপত্তা পরিষদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকের ব্যবস্থা করতেই হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে চীন তার প্রভাব বিস্তার করে পাকিস্তানের জন্য এইটুকু করতে পেরেছে। কিন্তু যেখানেও পাক-চীন জুটির জন্য অপেক্ষা করেছিল একরাশ হতাশা। কাশ্মীর নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক হলো ঠিকই, কিন্তু কোনো বিবৃতি জারি করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে যে কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা হয়েছে। চীন চেয়েছিল বৈঠকের পর অন্তত একটি বিবৃতি জারি করা হোক। নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য তাতেও রাজি হয়নি। ভারতের চিরাচরিত অবস্থান হলো কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফলে এখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে ভারত যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং আন্তর্জাতিক সমাজ ভারতের এই অবস্থানই মেনে নিয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে ভারতের একটি বড়ো কূটনৈতিক সাফল্য।

খ্রিস্টের জন্মের প্রায় তিন দশক আগে ভারতীয় রাজনৈতিক দার্শনিক কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে রাষ্ট্রমণ্ডল তত্ত্বে অরি (শত্রু) ও মিত্র বিচার করে কোনো রাষ্ট্রকে তাঁর বিদেশনীতি নির্ধারণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর এর প্রায় দু' হাজার বছর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে মার্কিন আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিদ্ হ্যান্স্ জে. মরগেনথাউ তাঁর Politics Among Nations গ্রন্থে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বিবেচনার মধ্যে আনার সুপারিশ করলেন। তাঁর মত ছিল রাষ্ট্রের কার্যকলাপের মূল ভিত্তিই হবে 'ক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ধারিত জাতীয় স্বার্থ'। স্বাধীনোত্তর ভারতের নেহরু সৃষ্ট বিদেশ নীতিতে ক্ষমতাশালী হওয়া এবং জাতীয় স্বার্থরক্ষা এই বিষয়গুলিই অবহেলিত ছিল। নেহরুর ভুলে ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিম অংশ থেকে পাক হানাদারদের হঠিয়ে দিতে পারেনি। নেহরুই অপ্রয়োজনে কাশ্মীর সমস্যাকে জাতিপুঞ্জের দরবারে নিয়ে গেছেন। নেহরুর ভুলে লাদাখের ১৪০০০ বর্গমাইলেরও বেশি অংশ এখনো চীনের দখলে। নিজেকে শক্তিশালী দেশ না বানিয়ে ভারত তৃতীয় বিশ্বের দেশ হয়েই খুশি থেকেছে। অন্যদিকে বাস্তবমুখী আভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতি অনুসরণ করে চীন বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠেছে। এই ঐতিহাসিক ভুল সংশোধনের প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রাধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। বর্তমান সরকার সেই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে গেছে আরো দ্রুত। ভারতের এই নতুন নীতি নিঃসন্দেহে ফলদায়ক হয়েছে। এখন আর ভারতকে কেউ দুর্বল দেশ বলে মনে করে না। ভারত বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ। ৩৭০ ধারা বিলোপের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য তারই ইঙ্গিতবাহী। ■

যাঁরা করাচীর ভাষায় কথা বলছেন তাঁদেরও জেলবন্দি করা হোক

সুজিত রায়

"কাশ্মীরে যদি হিন্দু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হতো, তাহলে বিজেপি সংবিধানের ৩৭০ ধারাকে স্পর্শও করত না। কিন্তু যেহেতু কাশ্মীরে মুসলমান সম্প্রদায়ই সংখ্যাগুরু, সেজন্যই বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ৩৭০ ধারা বাতিল করেছে। বিশ্বের কোথাও কী এমন নজির আছে যেখানে পেশীশক্তির সাহায্যে কোনও দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে?"

"এক তরফাভাবে জম্মু ও কাশ্মীরকে বিভক্ত করে দিয়ে জাতীয় সংহতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজই বিপন্ন হয়ে পড়ল। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জেলবন্দি করে এবং সাংবিধানিক পদ্ধতিকে অস্বীকার করে বিজেপি জাতীয় সংহতি প্রচেষ্টাকেই পিছিয়ে দিল। মনে রাখতে হবে ভারত তৈরি হয়েছে এর জনসমষ্টিকে নিয়ে। সেখানে কিছু জমির কিছু অংশই সব নয়। প্রশাসনিক ক্ষমতার এই অপব্যবহার আমাদের জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। কাশ্মীরের মূলস্রোতের জননায়করা ভিন্ন ভিন্ন অজানা এলাকায় জেলবন্দি হয়ে রয়েছেন। এই আচরণ শুধু অসাংবিধানিকই নয়, অগণতান্ত্রিকও। এটা দূরদৃষ্টির অভাব সঞ্জাত এবং তীব্র মূর্খামি। নেতৃত্বের এই ফাঁক পূরণে এগিয়ে আসবে জঙ্গিরাই এবং তার দায় বর্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরই।"

"আমি কোনোদিন ভাবতেই পারিনি ভারতবর্ষের মুকুট, ভারতবর্ষের মস্তিষ্ক জম্মু ও কাশ্মীরকে এভাবে ছেঁটে ফেলা হবে। সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল সংক্রান্ত বিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে যুক্ত হলো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন সংসদে বিলটি পেশ করলেন, মনে হলো সশব্দে ফেটে পড়ল একটি আণবিক বোমা। জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ মুসলমান হয়েও কখনও পাকিস্তানভুক্ত হয়নি। তারা ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতাকেই আঁকড়ে থেকেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া পদক্ষেপ দেশের সংহতির ভিতটুকুকেই দুর্বল করে দিল। জাতীয় সংহতি বিল পাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় না। ওটা সম্পূর্ণভাবে আত্মিক বিষয়।"

"জনগণের বিশ্বাস অর্জন না করে, রাজনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা না করে, কাশ্মীরে ৪৫০০ আধা সেনা নিয়োগ করে কেন্দ্র যেভাবে ৩৭০ ধারা বাতিল-সহ কাশ্মীরকে দুভাগে বিচ্ছিন্ন করল, তাতে দেশকে একত্রিত করার বদলে উলটো পথেই হাঁটল কেন্দ্র। এখনই যদি পদক্ষেপ বদল না করা হয়, তাহলে জনগণ রাস্তায় নামবে দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে এবং এই ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করতে।"

"যদি সংখ্যাধিক্যের জোরই মূল শক্তি হতো, তাহলে মেনে নিতে হবে হিটলারও গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহী ছিলেন। ভারতবর্ষে এখন যা হচ্ছে, তাতে মোদী এবং হিটলারের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?"

"জম্মু ও কাশ্মীরে যখন ৩৭০ ধারা লাগু হয়েছিল, তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তখন সংসদে আলোচনার সময় সর্দার প্যাটেল তো চেয়েইছিলেন যে কাশ্মীর পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া হোক।"

এগুলো সবকটিই বিবৃতি। প্রথমটি কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের। দ্বিতীয়টি প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর। তৃতীয়টি কাশ্মীরের কংগ্রেস নেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবি আজাদের। চতুর্থটি সিপিআইএম-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির। পঞ্চমটি সিপিআই-এর সর্বভারতীয় নেতা ডি রাজার এবং ষষ্ঠ বিবৃতিটি কংগ্রেসের প্রবীণ সাংসদ এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল সিব্বালের।

লক্ষণীয়, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিল, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে লাদাখকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং দুটি রাজ্যকেই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেওয়ার জন্য মোদী সরকারের ঐতিহাসিক ও জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নেবার পর বিরোধী পক্ষের হাজারো বিবৃতির মধ্যে এগুলো মাত্র বাছাই আধ ডজন। আরও লক্ষণীয় যে প্রতিটি বিবৃতিরই মূল লক্ষ্য— কাশ্মীরকে ইস্যু করে দেশে লাগামহীন অশান্তি তৈরিতে কাশ্মীরের জনগণকে উস্কানি দেওয়া, জিভের লাগামহীন মন্তব্য করে জঙ্গিবাদকে সমর্থন জোগানো। সাংবিধানিক পদক্ষেপের অকারণ বিরোধিতা করে রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ভাবনা না ভেবে দেশদ্রোহী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বুঝে গেছেন— সংখ্যালঘু তাস খেলার দিন শেষ। সুতরাং কাশ্মীর প্রসঙ্গে তাঁর বিবৃতি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের। বলা মুশকিল, এত বড়ো ইস্যুতে তাঁর মুখে বল্গা পরালেন কে? প্রশান্ত কিশোর নাকি তাঁর বিবেক?

মনোভাবের পরিচয় দেওয়া এবং কোনওভাবে একটা রাজনৈতিক ভাবনা জড়িয়ে দেওয়া যে বিজেপি সরকারের এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক এবং বাকি সব রাজনৈতিক শক্তিই ধর্মনিরপেক্ষভাবে একত্রিত ও সংগঠিত।

গত ৭০ বছর ধরে জওহরলাল নেহরুর সৃষ্টি করা কাশ্মীর সমস্যাকে দগদগে ঘায়ের মতো জিইয়ে রেখেছিল কংগ্রেস। কারণ শেয়ালের একটাই কুমিরছানা দেখানোর মতো কাশ্মীর সমস্যাকে জিইয়ে রেখে সংখ্যালঘু মুসলমান ভোটের জায়গির নেওয়া এবং তাঁবেদার স্থানীয় নেতৃত্বকে সবরকম আর্থিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে বলীয়ান করে নেহরু তথা গান্ধীপরিবার পরিচালিত কংগ্রেসের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা। বামপন্থী দলগুলির উদ্দেশ্য এর থেকে ভিন্ন কিছু নয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের ইতিহাসই বলে দেয়— বামপন্থীরা কখনই দেশের স্বার্থে দেশের পতাকা তুলে ধরেনি। চিরকালই তাঁরা চীনকে তাঁদের স্বদেশভূমি বলে মেনে এসেছে এবং প্রয়োজনে সুযোগ সন্ধানীর মতো চোরাপথে ভারতীয় সাজার অভিনয় করে দেশের মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে।

আজ যখন বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সাহসের সঙ্গে এবং সম্পূর্ণভাবে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ৭০ বছরের জ্বলন্ত সমস্যার সমাধান করেছে, তখন কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে এবং যেভাবে লাগামহীন বিবৃতির বান ডাকছেন, তাতে তাদের দেশদ্রোহী তকমা দেওয়া যেতেই পারে এবং কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ওমর আবদুল্লা বা নেত্রী মুফতি মেহবুবার মতো এদেরও জেলবন্দি করা উচিত দেশের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থেই। কারণ কংগ্রেসের এবং বামপন্থীদের বক্তব্য বিচ্ছিন্নতাবাদেরই শামিল।

১৯৮৯ সালে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লার প্রত্যক্ষ মদতে যখন কাশ্মীরে জেহাদি দৌরাত্ম্য কাশ্মীরের ভূমিপুত্র ছ' লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিতকে ঘরছাড়া করেছে। যখন প্রকাশ্য রাজপথে খুন করা হয়েছে জনপ্রিয় কাশ্মীরি পণ্ডিত নেতা টিকালাল টাপলুকে, যখন বিচারপতি নীলকণ্ঠ গঞ্জুকে খুন করে ফেলে রাখা হলো প্রকাশ্য রাজপথে এবং হুমকি দেওয়া হলো— মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।, যখন শিক্ষিকা গিরিরাজ টিপ্পুকে গণধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো, সেদিন কিন্তু এই ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস, এই সাম্যবাদী বামপন্থীরা কেউ বিবৃতি দেননি। ঝান্ডা নিয়ে পথে নামেননি। এবারও প্রতিবাদ জানাতে কাশ্মীরের মাটি ছোননি। আজও যখন লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিত পরিবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে উদ্বাস্তুর জীবন কাটাচ্ছেন তখনও এদের চোখের কোণে অশ্রুকণা চিকচিক করে ওঠে না। তখন এঁরা সংখ্যালঘুদের স্বার্থেই রাজনীতি করে যান নির্দয়ভাবে। কারণ ওরা বুঝে গেছেন— ভারত এখন জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ইসাহি— সকলেই সেই জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে সমবেত। এখন আর সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কও যথেষ্ট নয়।

অতএব, দেশে জঙ্গিবাদকে প্রশ্রয় দাও। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উস্কানি দাও। দেশের কোণে কোণে আগুন জ্বালাও। সর্বোপরি কথা বলো করাচীর ভাষায়। পাকিস্তানকে উজ্জীবিত কর। উত্তেজিত কর যাতে একটা যুদ্ধ বাঁধে। তাহলে অর্থনৈতিক অবদমনেরও সমস্ত দোষারোপ চাপানো যাবে মোদীর ঘাড়ে।

এটা পরিষ্কার--- প্রতিটি বিবৃতির পিছনেই রয়েছে এক গভীর চক্রান্ত। দেশের জনগণ তা বুঝে গেছে, তাই দেশের মাটিতেই আজ মুসলমান ভাই-বোনেরাও মিছিল করে মোদীজীর, অমিত শাহের পদক্ষেপকে স্বাগতম জানাচ্ছে। আওয়াজ ওঠেছে— ভারতমাতাকে টুকরো হতে দেব না।

পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বুঝে গেছেন— সংখ্যালঘু তাস খেলার দিন শেষ। সুতরাং কাশ্মীর প্রসঙ্গে তাঁর বিবৃতি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের। বলা মুশকিল, এত বড়ো ইস্যুতে তাঁর মুখে বল্গা পরালেন কে? প্রশান্ত কিশোর নাকি তাঁর বিবেক? ■

কাশ্মীর হিন্দু অধ্যুষিত রাজ্য হলে কেন্দ্র বিশেষ অধিকার খর্ব করত না। এটা করা হয়েছে কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান রাজ্য বলে।

— পি চিদাম্বরম

কেন্দ্রের ভেবেচিন্তে কাজ করা উচিত। নয়তো কাশ্মীর একদিন হাত ফস্‌কে বেরিয়ে যাবে।

— দিগ্বিজয় সিংহ

কাশ্মীরিদের অধিকার কেড়ে নিয়ে কাশ্মীরকে ভারতের প্যালেস্টাইন বানাতে চাইছে।

— মণিশংকর আয়ার

সংস্কার ভারতী শিলিগুড়ি শাখার নটরাজ পূজন ও ড. ওয়াকনকরের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন

সংস্কার ভারতী শিলিগুড়ি শাখার উদ্যোগে গত ২৮ জুলাই স্থানীয় সূর্যসেন কলোনিস্থিত সারদা শিশুতীর্থের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় নটরাজ পূজন ও পদ্মশ্রী ড. ওয়াকনকরের

জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান। 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী ভারতে নবজীবনম্' সমবেত ভাব সংগীতের পরে মঞ্চে উপস্থিত অতিথিগণের দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বলন ও নটরাজ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। প্রথমে সংস্কার ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা ড. ভি এস ওয়াকনকরের জীবনব্যাপী বিভিন্ন কর্মকৃতি ও সাধনার কথা উল্লেখ করে তাঁর উদ্দেশে শতবর্ষ স্মারক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ড. ভি এস ওয়াকনকর শতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সংযোজক কমলেশ সরকার। প্রধান অতিথির ভাষণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিলিগুড়ি বিভাগ প্রচারক নরেন্দ্রনাথ বেরা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের শুভ সংস্কারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং সংস্কার ভারতীর মহৎ উদ্যোগে সহযোগী হতে সকলকে আহ্বান জানান।

উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব নটরাজের উদ্দেশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংস্কার ভারতীর শিলিগুড়ি শাখার সংগীত বিভাগের শিল্পীদের সমবেত সংগীতাঞ্জলির মাধ্যমে কলাশিল্পের পরমগুরু নটরাজ বন্দনা ও বিভিন্ন শিল্পীর একক উপস্থাপনা পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে মঞ্চস্থ হয় সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান। কত্থক ও ভরতনাট্যম্ আঙ্গিকে পরিবেশিত বিভিন্ন নৃত্য নিবেদন দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জানান সংস্থার সম্পাদক শঙ্কর নাথ।

হাওড়ায় সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রগুলির মধ্যে বেশিরভাগ অবলুপ্ত হলেও হাওড়ার সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ এখনও সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। গত ২৪-২৫ জুলাই সংস্থার উদ্যোগে তাদের নিজস্ব ভবনে 'বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা ও

মানবিকতা' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। সভায় প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পূর্বতন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। সংস্থার সম্পাদক ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রাচীন বিজ্ঞান ভিত্তিক সংস্কৃত গ্রন্থগুলির পাতা থেকে আরও আধুনিক বিজ্ঞান চর্চায় কীভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে তার উল্লেখ করে পুঁথি সংরক্ষণের জন্য স্থানাভাবের কথা বলেন। বর্তমানে সংস্কৃত শিক্ষার টোলগুলির প্রতি অবহেলার কথা বলেন সংস্থার সভাপতি ড. গোপাল চন্দ্র মিশ্র। শ্রীমুখার্জি ও তাঁর পুত্র অভিজিৎ মুখার্জি সংস্থাকে সাধ্যমতো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। সংস্থার পক্ষ থেকে প্রণব মুখার্জিকে 'রাষ্ট্রাধিপতি কুলতিলক' উপাধি দেওয়া হয়।

কর্ণমাধবপুরে ‘কর্মযোগী’র উদ্যোগে চক্ষু ও রক্ত পরীক্ষা শিবির

স্বয়ংসেবী সেবা প্রতিষ্ঠান ‘কর্মযোগী’র উদ্যোগে গত ১০ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কর্ণমাধবপুরে চোখের রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও রক্ত পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে সামগ্রিক ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় বারাসাতের প্রতিষ্ঠিত চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র ‘ডাক্তার সরকার ডে আই কেয়ার’। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শল্য চিকিৎসক ডাঃ তরুণ সরকার ৫৬ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা, ছানি নির্ণয়

ও চোখ সংক্রান্ত যাবতীয় চিকিৎসা করেন। সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট প্যাথলজিস্ট ডাঃ মানস কুমার দে । হৃদয়পুরের প্রণব কন্যা সঙ্ঘ আধুনিক মানের চক্ষু পরীক্ষা যন্ত্র স্লিটল্যাম্প দিয়ে সহযোগিতা করে। শিবিরে কর্ণমাধবপুর, বন্দিপুর, অপূর্বনগর, তালবান্দা, জাফরপুর, খড়দহ, সোদপুর, মহিষপোতা প্রভৃতি দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে রোগীরা আসেন। শিবিরে উপস্থিত থেকে সবাইকে উৎসাহিত করেছেন কর্মযোগীর সভাপতি নারায়ণ মণ্ডল, অসীম মণ্ডল, সুব্রত দত্ত এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক ডাঃ সনৎ কুমার বসুমল্লিক।

কলকাতা সাহিত্য অ্যাকাডেমির কবিতা পাঠের আসর

গত ১৮ জুলাই কলকাতা সাহিত্য অ্যাকাডেমির আঞ্চলিক দপ্তরে গল্প ও কবিতা পাঠের আসর ‘অস্মিতা’ অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচজন মহিলা সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় অ্যাকাডেমির আঞ্চলির সচিব ড. দেবেন্দ্র কুমার দেবেশ আমন্ত্রিত অতিথি ও দর্শকদের সঙ্গে কবি-সাহিত্যিকদের পরিচয় করিয়ে দেন। কবি মিতুল দত্ত তাঁর ‘জাতিঘর’, ‘উইক এন্ড’, ‘স্নানযাত্রা’ ও ‘ডিএনএ’-সহ বেশ কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন। ডিজিটাল মিডিয়া মানুষের জীবনে কী ধরনের কুপ্রভাব বিস্তার করছে, তৃষ্ণা বসাক তাঁর ছোটো গল্প ‘টকিং মালতি’তে তা তুলে ধরেন। দীপান্বিতা সরকার ‘ভাষা’, ‘নিরপেক্ষ’, ‘তুমি যাচ্ছ’ এবং স্রোতস্বিনী চট্টোপাধ্যায়ের ‘গোধূলি’, ‘কুহক’, ‘ফাঁদ’-সহ বেশ কয়েকটি কবিতা শ্রোতা-দর্শকদের শোনান। বয়স্কদের প্রতি সন্তানসন্ততির মনোভাব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বিনতা রায়চৌধুরী তাঁর ‘চেনা ছবির ভেতরে’ গল্পে। অনুষ্ঠানের শেষে সমাপ্তি ভাষণ ও ধন্যবাদ জানান ড. দেবেন্দ্র কুমার দেবেশ।

স্বাধীনতা দিবসে কল্যাণ ভবনে স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সংবর্ধনা

স্বাধীনতা দিবস, ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন ও রাখিবন্ধন উপলক্ষ্যে পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে কলকাতা কল্যাণ ভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে শতবর্ষ বয়স্ক স্বাধীনতা সংগ্রামী পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাধীনতা সংগ্রামীর সম্মানে একশোটি প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। তরপর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে কল্যাণ আশ্রমের মানিকতলা মহিলা সমিতির সদস্যারা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কল্যাণ আশ্রমের প্রাদেশিক সভাপতি বিশ্বনাথ বিশ্বাস। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ আশ্রমের সর্ব ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক যোগেশ বাপট। উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ আশ্রমের পূর্বতন অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক গজানন বাপট এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীভট্টাচার্য। শ্রীভট্টাচার্যকে শাল, উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করেন মঞ্চস্থ অধিকারীগণ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তা বলরাম সাঁতরা। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে কল্যাণ আশ্রমের বিভিন্ন সমিতি দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। প্রধান বক্তা শ্রীবাপট তাঁর বক্তব্যে দেশ বিভাজনের করুণ ইতিহাস এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ আবার শক্তিশালী হতে চলেছে তার বিস্তৃত বর্ণনা করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীভট্টাচার্য স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীরা অখণ্ড ভারতের জন্য প্রাণ বলিদান করেছেন তার উল্লেখ করে বলেন জম্মু-কাশ্মীর-লাদাখ এতদিনে প্রকৃত স্বাধীনতা পেল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা এবং ধন্যবাদ জানান কল্যাণ আশ্রমের প্রাদেশিক সম্পাদক অমিত সাঁতরা। উল্লেখ্য, এদিন অনুষ্ঠানে কল্যাণ আশ্রমের সভাগারটি পূর্বক্ষেত্রে কল্যাণ আশ্রমের স্থপতি প্রয়াত বসন্তরাও ভট্টের নামে উৎসর্গ করা হয়।

স্বাধীনতা দিবসে নাগপুরে সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

আইসিসিআর-এ ‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’ ও ‘হিন্দু বিশ্ব’-এর প্রকাশ অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখপত্র মাসিক ‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’ এবং রাষ্ট্রীয় মুখপত্র হিন্দি ‘হিন্দু বিশ্ব’-এর ৪৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় গত ১৪ আগস্ট কলকাতা আইসিসিআর-এর সভাগারে। উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হিন্দু মিলন মন্দিরের সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ স্বামী গুরুপদানন্দ মহারাজ, মহাউদ্ধারণ মঠের অধ্যক্ষ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, রিষড়া প্রেমমন্দিরের স্বামী নির্গুণানন্দ মহারাজ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্ব ভারতীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. সুরেন্দ্র জৈন, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ড. মোহিত রায়, হিন্দি হিন্দু বিশ্বের সম্পাদক বিজয় শঙ্করজী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ব হিন্দু বার্তার সম্পাদক পীতারুণ মুখোপাধ্যায়। মঞ্চে উপস্থিত অধিকারীগণ বিশ্ব হিন্দু বার্তা ও হিন্দু বিশ্বের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। বক্তারা হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হিন্দু সংগঠনকে শক্তিশালী করা ওপর জোর দেন। প্রধান বক্তা ড. জৈন স্মরণ করিয়ে দেন বঙ্গপ্রদেশ ভারতবর্ষের নবজাগরণের পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান রাজ্য সরকারের অনাচারের বিরুদ্ধে আবার হিন্দু বাঙ্গালিরা রুখে দাঁড়িয়েছে।

সভা সঞ্চালনা করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা অমিয় সরকার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়।

মালদা বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে রক্তদান শিবির ও যোগ প্রতিযোগিতা

প্রতি বছরের মতো এবারও গত ১১ আগস্ট ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষ্যে মালদহ জেলার বাচামারী গভঃ কলোনি স্থিত বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের উদ্যোগে রক্তদান শিবির ও যোগ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মালদহ মেডিক্যাল কলেজের ডেপুটি সিএমওএইচ ডাঃ অমিতাভ মণ্ডল। ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর ক্ষুদিরাম বসুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করেন শিশু মন্দিরের প্রধান আচার্য পঙ্কজ কুমার সরকার। তিনি উপস্থিত সকলকে ১১ থেকে ১৮ আগস্ট স্বদেশি সপ্তাহ পালনে অনুপ্রাণিত করেন। মালদহ মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের প্রতিনিধি দলের কর্মীরা রক্ত সংগ্রহ করেন। শিবিরে শিশু মন্দিরের অভিভাবক-অভিভাবিকা, আচার্য-আচার্যা ও শিশু মন্দিরের প্রাক্তন বিদ্যার্থী সহ ৫১ জন রক্ত দান করেন। যোগ প্রতিযোগিতায় শিশু মন্দিরের প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর ৩০০ জন ভাই-বোন অংশগ্রহণ করে।

ব্যারাকপুর বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা

গত ২৮ জুলাই ব্যারাকপুর বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাতুলিয়া ও বন্দিপুর এলাকার ৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সমবর্ধনা জানিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা বই উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক উদয় বসু ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্বপন কুমার ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল-সহ বেশ কয়েকজন কার্যকর্তা।

বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপে তাঁর প্রকাশ

চূড়ামণি হাটি

গভীর সাধনার বাইরে এ সন্ধান। ত্রুটি থাকতে পারে। তবুও বলি শ্রীকৃষ্ণ হলেন বহু গুণের সমন্বয়। বিশেষ গুণের অনেক চরিত্রই যেন শব্দ যোগে কৃষ্ণ নামের সঙ্গে মিশে গেছে কিংবা কোনো কাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্য করতে জনপ্রিয় কৃষ্ণ নামটি ব্যবহার করা হয়েছে যার ফল কৃষ্ণ নির্দিষ্ট কোনো একটি চরিত্রে বাঁধা না পরে 'কৃষ্ণ' শব্দটি শত শত চরিত্রের মাঝে গুরুত্ব পেয়েছে। ওই নাম শব্দটির এতটাই প্রভাব ছিল যে, এ শব্দের সঙ্গে মিশে গেলে কোনো কলঙ্ক, ভয় স্পর্শ করতে পারে না। বৈদিক যুগে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে কৃষ্ণ ঋষিই হোন কিংবা অষ্টম মণ্ডলে অশুমতি তীরে বসবাসকারী অসুরাধিপতি, যেই হোন না কেন, আসলে কৃষ্ণ হলেন সূর্য-জ্যোতির সমতুল কোনো জ্যোতি বা শক্তি। যে শক্তি কৃষিজীবী ও অরণ্যবাসীদের মাঝে কোনো এক বা একাধিক শক্তিকে বধ ও বশ করেছিল তারা কিন্তু এ শক্তিকে নিজের মতো রূপ দিয়ে নিজেদের স্বকীয়তাও বজায় রেখেছিল।

যাদব জাতির উপাস্য দেবতা সূর্য। মহাভারতকে গুরুত্ব দিলে এ বিচারে শ্রীকৃষ্ণ যদু বংশের বৃষ্ণি কুলের। প্রপিতামহ দেবমীর ঐতরেয় আরণ্যক মতে কৃষ্ণহারীত গোত্রীয়। ঘটক জাতক টীকায় কৃষ্ণ কর্ণহয়ন গোত্রীয়। কৌশিতকী ব্রহ্মণ অংশ মতে অঙ্গীরস গোত্রীয়। ছান্দোগ্য উপনিষদ মতে অঙ্গিরা ঋষির বংশজাত 'ঘোর' নামক এক ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞ বিষয়ক অক্ষিতিমসি (পরিপূর্ণ), অচ্যুতমসি (অক্ষয়), প্রাণসংশিতমসি (প্রাণ রূপে সূক্ষ্ম তত্ত্ব) এই তিন মন্ত্র দিয়েছিলেন। পুরোহিত যদুকরের এ মন্ত্রগুলিই শ্রীকৃষ্ণকে যোগী পুরুষে পরিণত করতে পারে। পুরাণ মতে শ্রীকৃষ্ণ সন্দীপনি মুনির শিষ্য। কুলপুরহিত গর্গ। নানা মতে কৃষ্ণ যেই হোন না কেনে কৃষ্ণ এমন সব গুণের সমন্বয় যা আকৃষ্ট করে। আকৃষ্ট করে চিরস্থায়ী সুন্দর আনন্দ রূপ নিয়ে। কৃষ্ণ শব্দে 'কৃষ্ণ' ধাতুর অর্থই হলো আকর্ষণ। বিষ্ণুর মতো কোনো দৈব রূপ না নিয়েও গোপাল রূপেও আকর্ষণীয়। 'গো' অর্থে গোরু বা পৃথিবী যাইহোক না কেন, কৃষ্ণ দুয়েরই রক্ষক হয়ে লৌকিক- অলৌকিক সত্তা নিয়ে আকর্ষণের বস্তু। আলযুক্ত কৃষিক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চল থেকে ঢুকে পড়া বাঘের হাত থেকে গোসম্পদ রক্ষাকারী সাধারণ বাগাল রূপেও কৃষ্ণ আকর্ষণীয়। জট বংশীয় নীচ শূদ্র পশুপালক বা আভীর ট্রাইবের অন্তর্গত পশ্চিম ভারতের কোনো পশুপালক; অর্থাৎ কৃষ্ণ পশুপালক হিসাবেই বেশি গুরুত্ব পেয়েছেন। সুন্দর দেহ ও বিপিনবিহারী কেশ নিয়ে পীতাম্বর। হাতে বাঁশি কিংবা বিষ্ণুচক্র। কখনো কদমবৃক্ষ তলে গোপ-গোপীদের সঙ্গে। আবার কখনো যুদ্ধভূমিতে। শ্রুতি নির্ভর 'কৃষ্ণ' রূপ মানুষের মুখে ঘুরতে ঘুরতে এক দুই তিন করে একটির পর একটি ঘটনার সঙ্গ পেয়েছে।

রাধারূপ নিয়ে কৃষ্ণ রূপ এমনই একটি উদাহরণ হতে পারে। মাগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা কংস। কংস মথুরা রাজ উগ্রসেনের পুত্র। বসুদেব সন্তান সম্ভাবনাময়ী রোহিণীকে মথুরার কাছে ঘোষ পল্লীতে নন্দ নামে এক গোপ ব্যবসায়ীর গৃহে রেখে, মথুরার রাজকন্যা

দেবকীকে বিবাহ করেন। এমন সময় কংসের কানে আসে তার মৃত্যুর কারণ দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান। পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজ্যাধিকারকারী কংস ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে কারাবন্দি করেন। দেবকীর প্রতিটি সন্তানকে কংস নিজ হাতে হত্যা করেন। অবশেষে যমুনার এপারে মথুরার কারাগারে অষ্টম পুত্রের জন্ম হলো। নাম কৃষ্ণ। ওদিকে রোহিণীর গর্ভে যে পুত্র জন্ম নিয়ে নিয়েছে তার নাম বলরাম। বোন সুভদ্রা অর্জুনের স্ত্রী। কথিত আছে ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণের জন্মমুহূর্তে যমুনার ওপারে গোকুল ব্রজপুরী বৃন্দাবনে নন্দ ঘোষের স্ত্রী যশোদার কোলে জন্ম নিয়েছিল যোগমায়া। নররূপী নারায়ণের দু' স্থানে দু' রূপে জন্ম। নানা অলৌকিক কাহিনিকে আশ্রয় করে বসুদেব নন্দের অনুমতি নিয়ে যশোদার কোলে কৃষ্ণকে রেখে সদ্যোজাত যোগমায়াকে নিয়ে আসেন কংস কারাগারে। কংস ভেবে নিয়েছিলেন এ যোগমায়াই দেবকীর অষ্টম সন্তান। আবার কোনো অলৌকিক কারণেই তার এই বিশ্বাস ভঙ্গ হয়। কৃষ্ণের এরূপ জন্মের ঘটনাটি পতঞ্জলি মহাভাষ্য অনুসারে তৃতীয়-দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্ব। অন্য মতে দশম খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ মতে মহাভারতের যুদ্ধই হয়েছিল ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে কিংবা অন্য গণনামতে ১৪৩০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। যদি শ্রুতিনির্ভর সংরক্ষিত ঋগ্বেদের বিচারে আসা যায়— ব্যাখ্যাকার যাস্ক থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের এবং তিনি নিজে তার পূর্বের সাতজন পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যাকারদের প্রসঙ্গ টেনেছেন। সহজ ব্যাখ্যায় দ্বাপর যুগ হিসাবেই চিহ্নিত হয়। আর বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের বর্ণনা মতে কৃষ্ণের আবির্ভাব খ্রিস্টপূর্ব দশম কিংবা নবম শতকের প্রথম ভাগ।

কৃষ্ণ ভোজবংশীয় কংসকে বধ করে কংস পিতা উগ্রসেনকে রাজত্ব ফিরিয়ে দেন। কন্যাদের কথা ভেবে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে জরাসন্ধ বারে বারে আক্রমণাত্মক হওয়ায় কৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করে সাগরদ্বীপ দ্বারকায় চলে যান। প্রথম জীবনে কংসের আক্রমণও তাকে এক প্রকার যাযাবরে পরিণত করেছিল। কৃষ্ণের নীতি হলো, সংকটের মুখে বহু মানুষকে ঠেলে দেওয়া নয়; সংকটকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেওয়া। একই সঙ্গে সময়ের উপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নিষ্কাম কর্ম করে যাওয়া। নিষ্কামের অর্থই হলো ভক্তি। কর্ম এবং ভক্তির সমন্বয়েই তিনি জ্ঞানী। গোপালক কৃষ্ণের গোরুগুলি যেমন এখানে-ওখানে গেছে তৃণরসের সন্ধানে। তাদের সাথী কৃষ্ণও খুঁজে নিয়েছেন তৃণরসের ন্যায় শক্তির উৎস। শক্তির উৎস খুঁজতে খুঁজতে এবং সে শক্তিকে সবার মঙ্গলের জন্য ব্যবহারের ইচ্ছা নিয়ে তিনি দার্শনিক ঋষি ও কুট কৌশলীর বহুরূপ নিয়ে বিরাট পুরুষে পরিণত হয়েছেন। এমন এক যোগীপুরুষ ভক্তের জন্য সংকোচ ভেঙে সারথিও হয়েছেন এবং বহু জনের স্বামী হয়েছেন। ভক্তাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা কৃষ্ণ সহজেই মিশতে পারেন। তাইতো কৃষ্ণকে ঘিরে এত লৌকিক আচার ও ব্যাখ্যা। লৌকিক ব্যাখ্যাগুলি বারে বারে উচ্চারিত হয়ে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে, তা ধর্মীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কিংবা বিকৃত হয়ে মূল ব্যাখ্যাই হারিয়ে গেছে।

বেদে 'রাধো বিশাখে' বলতে বিশাখা নক্ষত্র চিহ্নিত হয়েছে। ললিত মাধব (১ম অঙ্ক) মতেও রাধার অপর নাম তারা। যদিও এও ঠিক সূর্য ও বিষ্ণু বা কৃষ্ণ এবং তারকা ও গোপী শব্দার্থে অভিন্ন। সূর্য তেজের কাছে কোনো একটি তারার হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে আশ্চর্য কিছু নেই। রাসলীলার মতো কোনো খেলায় গোপ-গোপীদের মধ্য থেকে কৃষ্ণের পাশাপাশি এক গোপী হারিয়ে যাওয়া— এ ভ্রমকে আশ্রয় করেই রাধার কল্পনা। ঈর্ষাজনিত এ কল্পনা বিষয়টিকে কামনার পর্যায়ে ফেলেছে। অথচ মহাভারতকে কেন্দ্র করে রচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাধার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। কৃষ্ণ নানা বয়সের গোপ-গোপীদের আদরের। গান্ধর্বী প্রধান গোপী। কৃষ্ণযাত্রায় রাধা ও চন্দ্রাবতী একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। চৈতন্য পূর্বে রাধা ও চন্দ্রবতীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মহাভারতে কর্ণের পালিতা মাতা রাধা-তো এই প্রসঙ্গে আসেই না। চৈতন্য পরবর্তী পর্যায়ে রাধার উপস্থিতি কৃষ্ণ সাধনাকে প্রেম সাধনায় পরিণত করেছে। শক্তি মন্ত্রের পাশে গুরুদীক্ষার নতুন মন্ত্র হিসাবে প্রেম মন্ত্রের আবির্ভাব ঘটলো। বলাবাহুল্য নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর পুত্র চৈতন্যদেব অর্থাৎ গৌর বিশ্বম্বরের জন্ম ৭ মার্চ ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে। সর্পবিষে মৃত লক্ষ্মীপ্রিয়া এবং পরবর্তীকালে বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামী। সন্ন্যাসী ঈশ্বর পুরীর শিষ্য। কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নেন। ষোড়শ শতকে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ চৈতন্যভাগবত লেখেন বৃন্দাবন দাস। সপ্তদশ শতকে চৈতন্যচরিতামৃত লেখেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। চৈতন্যদেবের সঙ্গী নিত্যানন্দের জন্ম ১২ জানুয়ারি ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে। বীরভূমের বীরচন্দ্রপুরের হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর সাত ছেলে ছেলের একজন। বাড়ুরী বংশের নিত্যানন্দ অর্থাৎ নিতাই এক সন্ন্যাসী গৃহেই মানুষ। খড়দহে পড়েছিল চরণ। স্ত্রী জাহ্নবা দেবী। পুত্র বীরভদ্র। সমসাময়িক ভগবত পুরাণ নিয়ে লীলা ভিত্তিক শ্রীকৃষ্ণ বিজয় রচয়িতা মালাধর বসুর জন্ম ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানে কুলীন গ্রামে। রাজস্থানে মীরাবাঈয়ের জন্ম ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে। ভক্তই যদি দেবতার সঙ্গে পুজিত হন, তাহলে আরাধিকা রাধা কোন সময়কালের ভক্ত— এ উত্তরের সন্ধানে গেলে কৃষ্ণের মতো রাধার মানবরূপের সন্ধান করতে হয়। প্রথম-দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃতে সপ্তশতীর গাথায় রাধা প্রসঙ্গ আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রাচীন পুরাণ নয়। এই পুরাণে রাধার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুভক্ত যুবতী রাধা শিশু কৃষ্ণকে বিষ্ণু জ্ঞানে জড়িয়ে ধরেন। ভক্ত রাধার এরূপ ব্যাখ্যা ত্রয়োদশ শতকে বড়ুচণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে গ্রাম্য প্রণয় লীলায় পরিণত হয়। ছড়িয়ে থাকা রাধা-কৃষ্ণ কথা কোনো বিশেষ কবি কাব্য রূপ দিয়েছেন। যেহেতু ধর্ম গ্রন্থ নয়, কাব্যের প্রয়োজনে চরিত্র ব্যাখ্যা বদলানো স্বাভাবিক। ১৩৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে শিক্ষিত সমাজে বা পরিশিলীত

সমাজে বেশ জনপ্রিয় ছিল। আর একটি ধারা ঐতিহ্যাশ্রিত হয়ে আঞ্চলিক ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। বঙ্গসংস্কৃতি জুড়েই তার বিবিধ রূপ। বঙ্গের বাইরেও।

বঙ্গীয় উপজাতিদের নৃত্য-গীত হলো ঝুমুর। যৌন কামনার সহজ রূপ নিয়ে বিষয় হয়েছে রাধা-কৃষ্ণ। পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম বাঁকুড়া, উত্তর-পশ্চিম পুরুলিয়া-সহ ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে এ নৃত্য-গীতের চর্চা। ঝাড়খণ্ড 'ডোম্বচাণ্ডালী' শব্দ দ্বারাও চিহ্নিত। যেন উত্তর রাঢ়বঙ্গের ডোমচাঁড়ালী। এ নৃত্য-গীত রাধা নয় শক্তির আরাধনা। আসলে নৃত্য-গীতের উৎসই হলো শক্তির চর্চা। অর্থাৎ আক্রমণ ও আক্রমণ থেকে রক্ষার কৌশল। রাধার প্রবেশ এ নৃত্য-গীতের চেনা ছক অনেকটাই বদলে দিয়েছিল। কোথাও কামনা ভালোবাসায় পরিবর্তিত হলো আবার কোথাও কামনার পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কোচবিহারে কানাই ধামলী পালাগানে রাধা-কৃষ্ণের কথপোকথনের মাধ্যমে কাহিনি এগিয়েছে। মাদার বাঁশের জারিতেও গুরুত্ব পেয়েছে ধামাইল দলের কৃষ্ণ-কাহিনিও। বিভিন্ন পালাগানে লোকশ্রুতি নির্ভর কৃষ্ণ কাহিনি গুরুত্ব পেয়েছে। উত্তরবঙ্গে তন্ত্রসাধনার গান তথা তুক্‌খা ভাব সংগীতেরও বিষয় হয়েছে রাধা-কৃষ্ণ। সাধক চিত্তের মিলন-বিরহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে দোলযাত্রার উল্লেখ বলতে একমাত্র বৃহদ্ধর্ম পুরাণে পুষ্পরাগ নিক্ষেপ প্রসঙ্গটি আছে। যেন প্রকৃতিই দেবতাকে দোলাচ্ছে। লোকনাট্য-সহ যাত্রাপালায় বা নাট গীতিকায় এসেছে কথা ও লৌকিক গাথা নির্ভর রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ। পাঁচালী গোষ্ঠী সুরেও। কৃষ্ণ বয়সের প্রতি স্তবকে স্পর্শ করে। পুতুলনাচের বিষয়ও হয়েছে গোপী পুতুল নাটক। আবার শুধু পুতুল গড়নেও নয়, শিশুকে ঘুমপাড়াতে ঘুমপাড়ানি ছড়াতেও এসেছে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ। ধাঁধা, প্রবাদ সর্বত্র। কথায় আছে কানু ছাড়া গীত নেই। কৃষ্ণ গান থেকে শ্যামলীলা। পটচিত্রে, মন্দির ফলকে নকশি কাঁথার সরাচিত্রে, পাথর ও ধাতু মূর্তি নির্মাণ সর্বত্র রাধা-কৃষ্ণের রূপ ফুটে উঠেছে।

কৃষ্ণ যখন স্বয়ং দ্বারকায় অবস্থান করছেন, তখনই কৃষ্ণ এতটাই জনপ্রিয় কিংবা মহাভারত রচনা কালে এতটাই জনপ্রিয় যে, ব্যাসদেব কৃষ্ণের বাল্যজীবন নিয়ে পুনরায় উল্লেখ প্রয়োজন মনে করেননি। কিন্তু অন্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের বাল্য পরিচয় রয়েছে। বলাবাহুল্য, গুজরাটের পশ্চিম উপকূলে দ্বারকা বন্দর কিন্তু কৃষ্ণের দ্বারকা 'ভেট দ্বারকা' সমুদ্রের নীচে চলে গেছে। কৃষ্ণ কথা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। লৌকিক ব্যাখ্যাকে দূরে রেখে দার্শনিক ব্যাখ্যা মতে, কৃষ্ণ এক ছিলেন, নিজেকে আস্বাদন করার জন্য বহু হয়েছেন। এ ব্যাখ্যা মতে কৃষ্ণ থেকেই রাধার উৎপত্তি। কিন্তু কাব্য মতে রাধা সাগর রাজা ও পদুমার কন্যা। অন্যমতে বৃষভানু ও কৃত্তিকার কন্যা। যেই কৃত্তিকা সেই কীর্তিদা সেই কলাবতী। বোন অলঙ্গমঞ্জুরী, ভাই শ্রীদাম। বৃক ও জটিলার পুত্র অর্থাৎ যশোদারই সহোদর আয়ন ঘোষ রাধার স্বামী। রাধার ননদ কুটিলা। লীলাসঙ্গিনী বড়াই। রাধার হঠাৎ উপস্থিতি, আবার এই মানব পরিচয় এ সবকিছু মিশে কৃষ্ণলীলাকে বড়োই চমকপ্রদ করেছে। বিশেষ করে রাধার রূপ মাধুর্য এবং বিবাহিত জীবন— এ দুয়ে কৃষ্ণ চরিত্রকেই অসহায় করেছে। বড়ায়ীর পরামর্শে রাধা কৃষ্ণকে পতিরূপে পেতে কাত্যায়িনী ব্রতও করেছে। তার উপর রুক্মিণী-সহ কৃষ্ণের কোনো স্ত্রী স্বামীর পাশে বিগ্রহ রূপে স্থান না পাওয়াটিও এক প্রকার রাধারই জয়। হরা অর্থাৎ রাধা ভক্তেরই প্রতিক হয়ে দেবী রূপ পেয়েছেন। সৌর্যপুর নগরের যজ্ঞ দত্ত ও সোমযশার পুত্র নারদও সে স্থান পাননি। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর উপাসনার পাশাপাশি ক্রমশ গুরুত্ব পেয়েছে কৃষ্ণের দাস্য ভাবের উপাসনা। আশ্রয় শ্রীরাধিকার চরণ। নানা বর্ণের মানুষ ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হয়েছেন। সঙ্গে চিঁড়ে দধি মহোৎসব। ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যদেবের কথা ও সুরের মিলনের কীর্তনকে গীতি সুর থেকে সরিয়ে পদাবলীর গান গাইবার যে নতুন ঢঙের প্রবর্তন ঘটান, তাই হলো হরিনাম সংকীর্তন। জাহ্নবীদেবীর উদ্যোগে মহোৎসবের সূচনা ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা সন্তোষ দত্তের সহযোগিতায় রাজশাহির খেজুরিতে ছয়টি বিগ্রহ নির্মাণ করে।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মথুরায় শূরসেন গোষ্ঠীর মধ্যে 'ভারতীয় হেরাক্লেস' অর্থাৎ কৃষ্ণের পুজো হতো। এমন মত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে আসা গ্রিক পর্যটক মেগাস্থেনিসের বিবরণে রয়েছে। দ্বাদশ শতকের পরবর্তী সময়ে ভক্তিবাদকে আশ্রয় করেই মূলত কৃষ্ণ পূজার প্রচলন অন্য মতে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তিনি মহাভারত যুদ্ধের মাধ্যমে অধর্মের সঙ্গী আর্যদের এবং বীর অনার্যদের মৃত্যুর কারণ। সেই কৃষ্ণ সাধারণ অনার্য জরা ব্যাধের হাতে মানবলীলা সংবরণ করেন। কথিত মতে পূর্ব জন্মে ওই ব্যাধ ছিলেন সুগ্রীব। যোগাবিষ্ট অবস্থায় থাকা কৃষ্ণের সুন্দর পদযুগলকে হরিণ বা পাখি ভেবে তির নিক্ষেপ করেছিলেন ওই ব্যাধ। কথিত মতে কৃষ্ণের দাহক্রিয়া সমাধার পর দেহাবশিষ্ট সমুদ্রের জলে ভাসানো হয়েছিল। যা কাঠ হয়ে নীলগিরি পর্বতে ঠেকেছিল। এ কাঠেই পুরীর জগন্নাথের মূর্তি নির্মিত হয় এমনই বিশ্বাস। কিছু সত্য আর কিছু রূপক কল্পনা তথা দিব্য ভাবলোকের মিলন ঘটিয়ে কৃষ্ণকে ঘিরে সেজে উঠেছে নানা কথা। দৈত্য বধ থেকে ক্রিড়া-কৌতুক প্রতিটি ঘটনাচিত্র একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেন এ ঘটনাগুলি একজনই ঘটাতে পারেন। ওই একজনকে আশ্রয় করে এ সম্ভব নয়; তাও ভাবা যায়। কৃষ্ণ যেন প্রকৃতির শব্দ। যাকে অনুভব করা যায় কিন্তু ধরা যায় না।

অনেক চরিত্রের মধ্যে ধরা দেয় কিন্তু সেই চরিত্রগুলির ভিড়েই হারিয়ে যায়। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

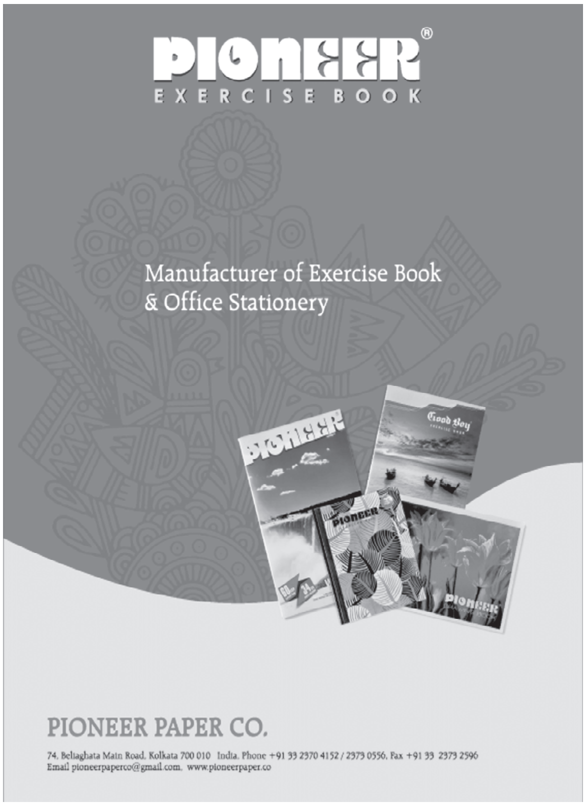

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

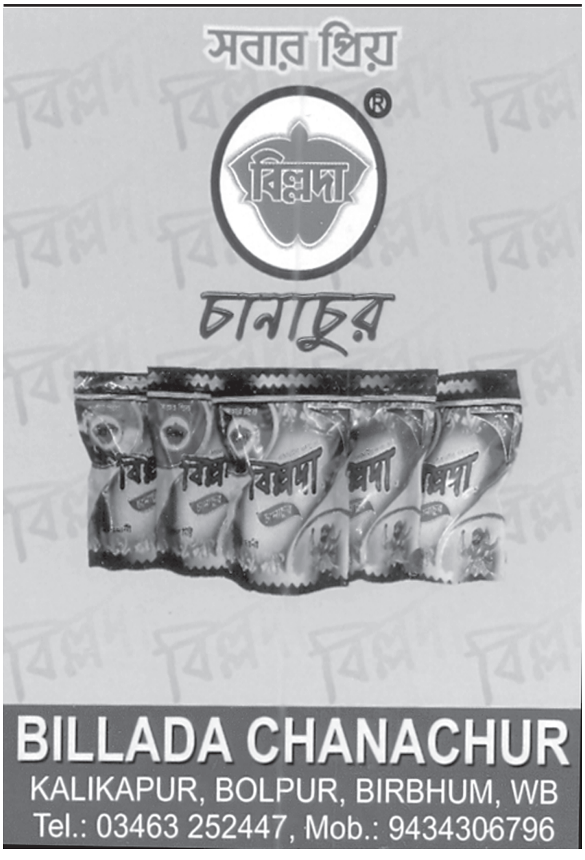

অভিমানী

সিদ্ধার্থ সিংহ

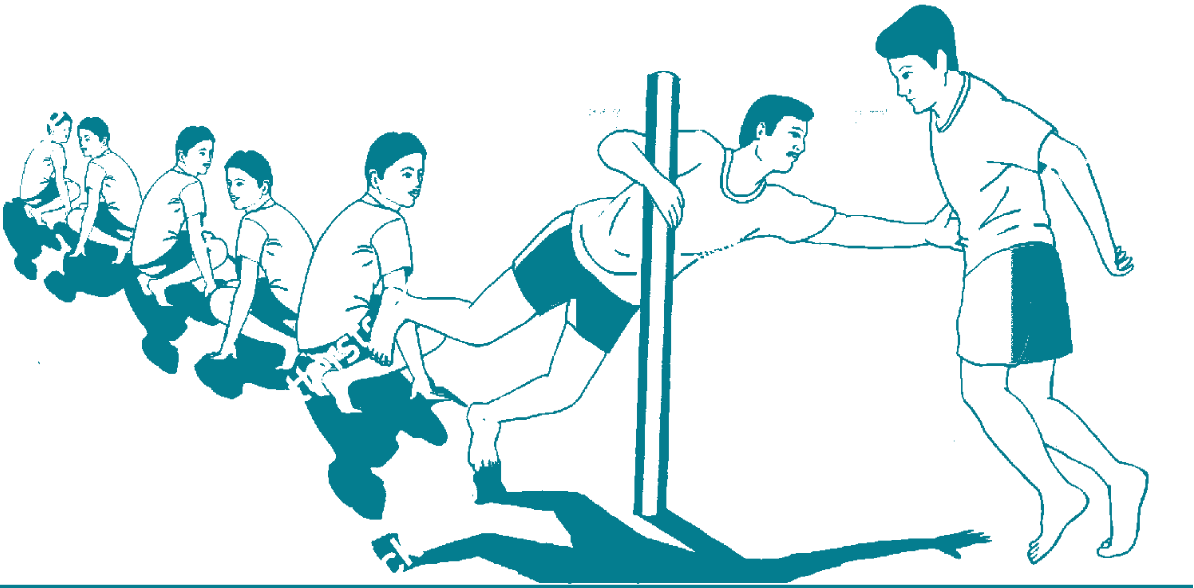

একে তাকে ধরে, গেম টিচারের কাছে হাজার অনুনয়-বিনয় করেও স্কুলের ক্রিকেট টিমে জায়গা হলো না তিমিরের। যতই সে ভালো খেলুক। ছুটে আসা এক-একটা আগুনের গোলাকে মেরে যতই তালগাছের উপর দিয়ে গ্রামের সীমানার ও পারে পাঠাক, চিলের চেয়েও ক্ষিপ্র গতিতে উড়ে গিয়ে বাতাসের কবল থেকে ছোঁ মেরে লুফে নিক এক-একটা বল, ব্যাটে কোনও রকমে বল ছুঁইয়েই চিতাবাঘের মতো দৌড়ে এক রানের জায়গায় নিয়ে নিক তিন রান, তবু কোনও স্কুল টিমে চান্স পাওয়ার জন্য শুধু এগুলোই যথেষ্ট নয়, তার জন্য অন্য কিছু লাগে।

তা হলে কী হবে! তিমির জিজ্ঞেস করতেই, গেম টিচার বললেন, তুই একটা কাজ কর। তুই বরং খো খো-য় নাম লেখা। ওখানে এখনও জায়গা আছে। দেরি করলে ওটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত খো খো! হ্যাঁ, ছোটোবেলা থেকে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে সে খো খো খেলেছে ঠিকই, কিন্তু তা বলে...ক্রিকেট থেকে একেবারে খো খো-য়!

ওর বাবা বলেন, যে কাজই করবি, সেটা যদি জুতো সেলাইও হয়, সেটাও মন দিয়ে করবি। দেখবি, একদিন না একদিন ঠিক তার কদর পাবি।

গেম টিচার বললেন, কী করবি বল?

গত বছর ওর ক্লাসেরই এক বন্ধু খো খো-য় নাম লিখিয়েছিল। এত খেলা থাকতে ও কেন খো খো-য় নাম লেখাল, জিজ্ঞেস করতেই ও বলেছিল, দ্যাখ, ক্রিকেট খেলতে গেলে যা খরচা হয়, তা আমাদের মতো তস্য গ্রামের হাভাতে ঘরের ছেলেদের পক্ষে সম্ভব নয়। তুই তো জানিস, আমার বাবা পরের পুকুরে মাছ ধরে। তাতে আর ক'টাকাই বা পায়, বল! অথচ ক্রিকেট খেলতে গেলে... একটা কিটসেরই কত দাম! অথচ খো খো খেলতে গেলে প্রায় কিছুই লাগে না। শুধু লাগে— অফুরন্ত দম, গতি, কৌশল, শক্তি, ক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা আর ভারসাম্য বজায় রাখা। ব্যাস। এগুলি হলেই হলো।

ওর আর এক বন্ধু বলেছিল, আমাদের দেশে এই মুহূর্তে কত ছেলে ক্রিকেট খেলছে জানিস? যদি দশ লক্ষ ছেলেও খেলে, তার মধ্যে ক'জন চান্স পাবে বল তো? খুব বেশি হলে কুড়ি জন। তার মানে দলে জায়গা পেতে গেলে তোকে কত জনের সঙ্গে লড়তে হবে? সেই তুলনায় খো খো-য় তো ভিড় অনেক কম। আর তাছাড়া, এটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় খেলা। সেটা ছেড়ে আমরা কেন বিদেশের খেলা খেলতে যাব, বল?

মনের মধ্যে খুঁতখুঁত করলেও ওই কথাগুলো মনে পড়তেই তিমির বলল, ঠিক আছে, তা হলে তাই করি...

গেম টিচার বললেন, তাহলে কাল সকালে মাঠে চলে আসিস।

এমনিতেই খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে ও। ক'দিন ধরে আরও ভোরে উঠছে। উঠেই, কাঁচালঙ্কা আর নুন দিয়ে পান্তাভাত খেয়েই স্কুলের মাঠে চলে আসছে। সেখানে একেবারে নিয়ম মেনে কোর্ট কাটা হয়েছে। প্রতিদিন খেলার আগে গেম টিচারের দেখিয়ে দেওয়া কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করছে। এ মাথা থেকে ও মাথা দৌড়োচ্ছে।

গেম টিচার আগেই বলে দিয়েছেন, তোরা আগে যে ভাবে খো খো খেলতিস, সেটা ভুলে যা। মনে রাখবি এটা একটা দলগত খেলা। এক দল চেজ করে অন্য দল ডিফেন্স।

যারা চেজ করে, সেই দলের ন'জনের আট জন দু'দিকের দুই খুঁটির মাঝ বরাবর সমান্তরাল রেখাকে প্রস্থের দুই প্রান্ত ছুঁয়ে যে আটটি সমান দূরত্বের রেখা ভেদ করেছে, সেই আটটি রেখার সংযোগ স্থলে গিয়ে বসে। পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে। আর নবম জন দু'দিকের যে কোনও একটি খুঁটির কাছ থেকে চেজিং শুরু করে। চেজ মানে দৌড়ে গিয়ে ডিফেন্ডারকে ছোঁয়া। ছুঁলেই আউট। এই চেজারের মুখ যে দিকে থাকে তাকে সে দিকেই ছুটতে হয়। সে পিছন ফিরতে পারে না। পিছন দিকে যেতে গেলে সামনের খুঁটির ওপাশ থেকে ঘুরে আসতে হয়। এমনকী চেজারদের মাঝখান দিয়েও গলে যেতে পারে না।

আর যারা ডিফেন্স করে, তাদের ন'জন খেলোয়াড়ও একসঙ্গে মাঠে নামে না। সেই ন'জনকে দক্ষতা আর যোগ্যতা অনুযায়ী তিন জন করে তিনটে উপদলে ভাগ করা হয়। প্রথমে একটি উপদল নামে। তারা ম'র হয়ে গেলে, মানে আউট হয়ে গেলে পরের উপদলটি নামে। তারা ম'র হওয়ার পর শেষ উপদলটি। এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই যদি তিনটি উপদলই ম'র হয়ে যায়, তাহলে আবার প্রথম উপদলটি নামে।

না। ন' মিনিট করে নয়। ওটা বড়োদের জন্য। তাদের বয়েস যেহেতু আন্ডার টুয়েলভ, তাই সাত মিনিট করে এক-একটি পর্ব। মোট চারটি পর্বের খেলা। সাত-তিন-সাত-ছয়-সাত-তিন-সাত ছকে। আগের পর্বে যারা চেজিং করে, পরের পর্বে তারা ডিফেন্স করে। খেলা শেষে চেজাররা যত জনকে ম'র করে, তারা তত পয়েন্ট পায়। যে দল বেশি পয়েন্ট পায়, তারাই বিজয়ী হয়।

বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে চেজার আক্রমণ শুরু করে। কোনও চেজার কোনও ডিফেন্ডারকে নাগালে না পেলে খুঁটির মাঝ বরাবর বসে থাকা সব চেয়ে কাছের চেজারের পিঠ ছুঁয়ে 'খো' বলে। 'খো' পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে পড়ে। আর তার জায়গায় বসে পড়ে, যে তাকে 'খো' দিয়েছে, সে।

ক'দিন প্র্যাকটিস করেই সবাই মোটামুটি সড়গড় হয়ে গেছে। তবু গেম টিচার বললেন, কালকে কলকাতা থেকে বলরামবাবু আসবেন। দু'দিন থাকবেন। তিনি শুধু খো খো-র প্রশিক্ষকই নন, রাজ্য খো খো সংস্থার যুগ্ম সম্পাদকও। উনি তোদের পারফরম্যান্স দেখে ঠিক করে দেবেন কে কে টিমে থাকবে। কালকেই। সুতরাং কাল যে আসবে না, স্কুল টিমে তার আর জায়গা হবে না।

বলরামবাবু আসতেই, স্কুল পরিচালন কমিটির এক সদস্য তাঁকে বললেন, 'এখানে খুব সাপের উপদ্রপ। রাত্রে আরও বাড়ে। আপনি বরং আমাদের বাড়িতে থাকবেন, চলুন।' কিন্তু বলরামবাবু রাজি হলেন না। তাই তাঁর থাকার ব্যবস্থা হলো স্কুলেরই একটি ঘরে।

ছেলেরা একটু আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। খানিক বাদেই গেম টিচারের সঙ্গে বলরামবাবুও মাঠে এলেন। এসেই বললেন, তোমরা খো খো খেলতে এসেছ। খুব ভালো কথা। কিন্তু তোমরা সবাই ভালোবেসেই খো খো খেলতে এসেছ তো? নাকি, অন্য খেলায় সুযোগ পাওনি দেখে খো খো-য় এসেছ? যদি দ্বিতীয়টা হয়, তবে সাবধান। এ খেলা কিন্তু ভীষণ অভিমানী। তাকে ভালোবেসে তার কাছে না এলে, সেও সহজে কাউকে কাছে টেনে নেয় না। বরং ছলে বলে কৌশলে ঠিক দূরে সরিয়ে দেয়। এটা মনে রেখো। কেমন?

আর একটা কথা, এই খেলায় সব চেয়ে সুবিধে হলো, এতে খেলোয়াড় খাটো হলে ডিফেন্সের সময় যেমন ভড়কি দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুবিধে পায়, তেমনি লম্বা হলেও চেজিংয়ের সময় বড়ো বড়ো পা ফেলে ছুটে গিয়ে অনেক দূর থেকেই হাত বাড়িয়ে ডিফেন্ডারকে ম'র করে দিতে পারে। তাই আমরা দু'ধরনের খেলোয়াড়কেই দু'রকম ভাবে তালিম দেব।

তবে তার আগে, এটা যেহেতু গ্রাম, ইনডোরে ম্যাট্রেসের উপরে ম্যাটের জুতো পরে তোমরা খেলছ না, তাই খো খো খেলার জন্য যেখানে কোর্ট কাটা হবে, সেই জায়গাটা আগে ভালো করে পরিষ্কার করে নেবে। যাতে সেখানে কোনও ইটের টুকরো বা ভাঁড় ভাঙা মাথা তুলে না থাকে। এতে ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবু হাতের কাছে সব সময় একটা ফার্স্ট এইড বক্স রাখবে।

এসব বলে, ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বলরামবাবু বলেছিলেন, তবে তোমরা কে কে শেষ পর্যন্ত স্কুল টিমে থাকবে, তা তোমাদের দৌড়, টার্নিং, ব্যালান্স আর খেলার কৌশল দেখার পরেই আমি ঠিক করব। তোমরা তিনটে নাগাদ চলে এসো। ঠিক আছে?

প্রত্যেকেই ঘাড় কাত করেছিল।

স্কুল টিমে কে কে চান্স পাবে আজই তার তালিকা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। তাই তিনটের আগেই সবাই মাঠে চলে এসেছে। এসেছেন বলরামবাবুও। কিন্তু খেলা শুরু হতে না-হতেই তিনি খেলা থামিয়ে দিলেন। গেম টিচারকে বললেন, খুঁটি দুটোতে এত গাঁট কেন? ভালো করে চেঁছে একদম মসৃণ করে নেবেন। কারণ, চেজাররা যখন দৌড়ে গিয়ে ওটা ধরে বাঁক নেবে, তখন ওই গাঁটে লেগে হাতের তালু ছড়ে যেতে পারে। আর এমন ভাবে পোলটা পুঁতবেন, যাতে মাটির উপরে একশো কুড়ি সেন্টিমিটার দাঁড়িয়ে থাকে। এটাই নিয়ম। তাতে লম্বা হলেও কোনও খেলোয়াড়ের কোনও অসুবিধে হবে না।

ফের খেলা শুরু হলো। খানিকক্ষণ পরেই উনি আবার খেলা থামিয়ে দিলেন। চেজারকে বললেন, নিজের গতি কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করো। ডিফেন্ডার ঝট করে সেন্টার লাইনের ওপারে চলে গেল, আর তুমি নিজের গতি সামলাতে না পেরে অতটা চলে গেলে! অতটা গিয়ে তুমি যাকে খো দিলে, সে যখন উঠে দাঁড়াল, ততক্ষণে ডিফেন্ডার তো নিরাপদ জায়গায় চলে গেল। তোমার যা গতি ছিল, তুমি যদি হাত বাড়িয়ে নিজেকে ওর দিকে ছুঁড়ে দিতে, তাহলে ও ঠিকই আউট হয়ে যেত। সব সময় বুদ্ধি করে খেলো। বুদ্ধি করে।

তোমাকে কী করতে হবে? ছুঁতে হবে। ফুটবল খেলার সময় যেমন বল বেশিক্ষণ পায়ে ধরে রাখতে নেই, তাতে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় এসে বল কেড়ে নিতে পারে, এখানেও তেমনি। পাস করো, পাস। যে সামনে আছে, তাতে খো দিয়ে পাঠিয়ে দাও। আর যে সব চেজার বসে আছ, তারা একদম রেডি থাকো। যাতে খো পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো, বুঝেছ?

তিমিরের হঠাৎ মনে হলো, বলরামবাবু যা বলছেন, তাতে তো মনে হয় এটা আসলে একটা ছোঁয়াছুঁয়ির খেলা। ডিফেন্ডারকে আউট করতে হলে ছুঁতে হবে। আর এই খেলায় টিকে থাকতে হলে চেজারের ছোঁয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মানে সবটাই ছোঁয়াছুয়ির ব্যাপার। আহা, এটা যদি ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের হতো! ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল তিমির। ঠিক তখনই—

তোমাকে আর একটা কথা বলি। বলেই , উনি তিমিরকে বললেন, তুমি ওই পোলটাকে ধরে বাঁক নেওয়ার সময় নিজের ভারসাম্যটাকে ধরে রাখতে পারলে না কেন? শরীরটা ও দিকে এতটা ঝুঁকিয়ে দিলে যে আর একটু হলেই পোলটা ভেঙে যেত। ভাঙলে কী হতো জানো? এর মধ্যে তোমরা যে পাঁচ জনকে ম'র করেছ, সেটা বাতিল হয়ে যেত। নাও নাও, শুরু করো...

আবার বাঁশি বেজে উঠল।

তিমির খুঁটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এবার সে চেজ করার জন্য এগোবে। সে এখন অনূর্ধ্ব বারোয় খেলছে। এর পর অনূর্ধ্ব চোদ্দোয় খেলবে। তারপর অনূর্ধ্ব উনিশে। স্কুল লেবেলে ঠিক মতো খেলতে পারলে এখান থেকেই সোজা জেলার টিমে। জেলা থেকে রাজ্য। রাজ্য থেকে জাতীয় টিমে।

না, জাতীয় টিমে নয়, গত বছর রাজ্যস্তরে চান্স পেয়েছিল তাদের গ্রামেরই এক ছেলে— নবাকু। সে তাকে বলেছিল, সে বার তাদের খেলা পড়েছিল কলকাতায়। রেড রোডের পাশে। রাজ্যস্তরের খেলা বলে কথা! সারা রাত দু'চোখের পাতা ও এক করতে পারেনি। শুধু স্বপ্ন দেখেছে। এমনিই, পাড়ায় পাড়ায় ফুটবল কিংবা ক্রিকেটের সামান্য ম্যাচ হলেও কী ভিড় হয়ে যায়! সেখানে এটা তো রাজ্যস্তরের খেলা। সব ক'টা রাজ্য একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে। গ্যালারি উপচে ভিড় নেমে আসবে মাঠে। এক-একজন ম'র হলেই উল্লাসে ফেটে পড়বে গোটা মাঠ। যে দলই জিতুক, তাদের সাপোর্টাররা বাজি ফাটিয়ে কান ঝালাপালা করে দেবে। আকাশ ভরে যাবে রঙে রঙে।

কিন্তু সে যখন মাঠে গিয়ে পৌঁছল, প্রথমে ভেবেছিল, সে বুঝি ভুল করে অন্য কোথাও চলে এসেছে। কিন্তু যখন জানতে পারল, না, এটাই সেই মাঠ, তখন শুধু অবাকই নয়, একেবারে হতাশ হয়ে গিয়েছিল।

মাঠ কোথায়! এটা তো মাত্র কয়েক হাত জমি! গ্যালারি তো অনেক দূরের কথা, একজন দর্শকও নেই। যারা খেলবে শুধু তারাই এসেছে। এ রকম যে হতে পারে তার ধারণাই ছিল না।

সে বলেছিল, রাজ্যস্তরের খেলার কথা। কিন্তু রাজ্যস্তরে অমনটা হলেও তিমিরের দৃঢ় বিশ্বাস, জাতীয় স্তরে নিশ্চয়ই অতটা খারাপ অবস্থা হবে না। তাই মাঠে দাঁড়িয়ে তিমিরের মনে হলো, স্কুল টিমে জায়গা পাওয়ার জন্য নয়, ও খেলতে নেমেছে জাতীয় দলের হয়ে। সামনেই কোর্টের মধ্যে তিন জন ডিফেন্ডার। কে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ভালো করে দেখে নিচ্ছে ও। একজনকে টার্গেটও করে ফেলেছে। নিজে না পারলেও যে আট জন সঙ্গী সেন্টার লাইনে বিপরীতমুখী হয়ে পর পর বসে আছে, ও তাদের কাউকে না কাউকে ঠিক খো দিয়ে দেবে তাকে আউট করার জন্য।

খুঁটির কাছে দাঁড়িয়ে শেষ বারের মতো ও যখন দেখে নিচ্ছে ডিফেন্ডাররা কে কোথায়, ঠিক তখনই কান বিদীর্ণ করা একটা চিৎকার ভেসে এল বহু দূর থেকে। ওর চোখ চলে গেল সে দিকে। ও দেখল, ওর ছোটো ভাই ওর নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে। ওই ভাবে একটা ছেলেকে ছুটে আসতে দেখে বলরামবাবুও থমকে গেলেন। গেম টিচারও বাঁশি বাজাতে ভুলে গেলেন। তিমিরও দাঁড়িয়ে পড়ল।

ছেলেটা সামনে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে তিমিরকে বলল, দাদা, এক্ষুনি বাড়ি চল। বাবাকে সাপে কেটেছে।

সেটা শুনে তিমির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দিকে ছুট লাগাল।

গেম টিচার চেঁচিয়ে উঠলেন, কীরে, কোথায় যাচ্ছিস? দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। এভাবে চলে গেলে তোর নাম কিন্তু স্কুল টিম থেকে বাদ পড়ে যাবে। ফিরে আয়, ফিরে আয় বলছি। এই ভাবে চলে যাস না।

কিন্তু ফেরা তো দূরের কথা, তিমির পিছন ফিরেও তাকাল না। সোজা ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে।

বাবাকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরে ডাক্তারবাবু যখন বললেন, 'আর ভয়ের কোনও কারণ নেই' তখন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিমিরের হঠাৎ মনে হলো, বলরামবাবু ঠিকই বলেছিলেন, খো খো খেলা খুব অভিমানী। ভালোবেসে তার কাছে না এলে, সেও সহজে কাউকে কাছে টেনে নেয় না। যে ভাবেই হোক, ছলে বলে কৌশলে ঠিক দূরে সরিয়ে দেয়, দূরে।

(পুনঃপ্রকাশিত)

সরদার বল্লভভাই প্যাটেল

সরদার বল্লভভাই প্যাটেলকে লৌহমানব বলা হয়। স্বাধীন ভারতের তিনি প্রথম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। অসম্ভব ছিল তাঁর মনের জোর ও কাজ করার উদ্যম। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। সেসময় ভারতবর্ষে ৫৬২ টি দেশীয় রাজ্য ছিল। তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে অথবা সামরিক অভিযান চালিয়ে সেগুলিকে ভারতের মধ্যে সম্মিলিত করার দুঃসাধ্য কাজটি তিনি করেছিলেন।

বল্লভভাইয়ের জন্ম ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর গুজরাটের পটেলাদ তালুকের করমসদ গ্রামে। তাঁর বাবা ঝবেরভাই প্যাটেল একজন সাধারণ কৃষক ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ঝাঁসির রানির সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। বল্লভভাই ছোটোবেলা থেকেই খুব স্বাভিমানী ছিলেন। খারাপ কিছু মেনে নেওয়া তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। ২২ বছর বয়সে তিনি নাড়িয়াদ স্কুল থকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর মোক্তারি পাশ করে প্র্যাকটিস শুরু করেন। কয়েক বছর পর বিলাত থেকে প্রথম শ্রেণীতে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। বিলাত থেকে ফিরে আমেদাবাদে ওকালতি শুরু করেন। গান্ধীজীর সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর ওকালতি ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে দেশসেবার কাজে লেগে পড়েন।

সর্বপ্রথম তিনি গোধরাতে গান্ধীজীর সভাপতিত্বে বড়ো

রাজনৈতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেখানে গুজরাটে বেগার প্রথা বন্ধের প্রস্তাব পাশ করান। এই সম্মেলনের ভাষণ ইত্যাদি তিনি ইংরেজির বদলে ভারতীয় ভাষায় শুরু করেন। সম্মেলনে তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জালিয়ানওয়াবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি দেশজুড়ে আন্দোলন খাড়া করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নেতৃত্ব দেন। গুজরাট বিদ্যাপীঠের জন্য তিনি দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। ইংরেজ সরকার সেই সময় গুজরাটের বোরসদ তালুকায় ৪০ হাজার টাকা ট্যাক্স ধার্য করে। বল্লভভাই প্যাটেল এর বিরুদ্ধে প্রবল জনআন্দোলন গড়ে তোলেন। ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়ে আদেশ প্রত্যাহার করে। ১৯২৭ সালে তাঁর নেতৃত্বে বারদোলিতে প্রবল কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। এবারও ইংরেজ সরকার পরাভূত হয়। এই সফলতার জন্য তাঁকে গান্ধীজী 'সরদার' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ হন।

১৯২৯ সালে গান্ধীজীর ডান্ডি অভিযানে সক্রিয় ভূমিকায় থেকে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। তাঁর তিনমাস জেল ও ৫০০ টাকা জরিমানা হয়। জরিমানা দিতে অস্বীকার করায় আবার তিন সপ্তাহের জেল হয়। জেল থেকে বেরিয়ে তিলক দিবসের শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে বোম্বাইয়ে আবার তাঁকে তিনমাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এর পরেও বিভিন্ন আন্দোলনের কারণে তিনি ১৯৩১, ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৫ সালে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হন। তার সঙ্গে তাঁকে তথ্য ও সম্প্রচার বিভাগ এবং স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলির দায়িত্ব দেওয়া হয়। অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে তিনি রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি ঘটান। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মাত্র আড়াই বছর তিনি জীবিত ছিলেন। ১৯৫০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁর জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তিনি দেশের পুনর্গঠনের জন্য যে কাজ করে গেছেন তাতে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর এই অবদানকে চিরজাগরুক করে রাখার জন্য বর্তমান ভারত সরকার 'ইউনিটি অব স্ট্যাচু' নির্মাণ করেছে। দেশবাসীর জন্য তাঁর বার্তা – 'উৎপাদন বাড়াও, খরচ কমাও'।

শ্যামসুন্দর ত্রিপাঠী

ভারতের পথে পথে

বারাণসী

পুরাকালের কাশী নগরীই বিশ্বের প্রাচীনতম শহর বারাণসী। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। পুণ্যসলিলা অর্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গার পশ্চিম তীরে বরুণা ও অসি নদীর মিলনস্থলে বারাণসী শহর। সপ্তপুরীর এক পুরী বারাণসী। পুরাকালে সুহোত্র-পুত্র কাশ্য কাশীনগরী পত্তন করেন। সূর্যোদয়ের সময় বারাণসীর আকাশ লাল রং ধারণ করে। বারাণসীর বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের শিবলিঙ্গ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। এখানকার হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি বিশ্বময়। বিশ্বনাথ মন্দিরের বিপরীত গলিপথেই অন্নপূর্ণা মন্দির। উৎসবের সময় স্বর্ণনির্মিত দেবীমূর্তির দর্শন পাওয়া যায়। ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে রয়েছে দুর্গামন্দির, তুলসী মন্দির, ভারতমাতার মন্দির, ভৈরবনাথের মন্দির, গণেশ মন্দির, দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রজেশ্বর শিব মন্দির। রয়েছে গঙ্গার বহু ঐতিহাসিক ঘাট।

জানো কি?

বর্তমান দেশ ও তার প্রাচীন নাম

● কম্বোডিয়া	কম্বোজ দেশ।
● থাইল্যান্ড	শ্যামদেশ।
● ভিয়েতনাম	চম্পাদেশ।
● লাওস	লবদেশ।
● মালয়েশিয়া	মলয়দ্বীপ।
● জাভা	যবদ্বীপ।
● আফগানিস্তান	গান্ধার, উপগণস্থান।
● বোর্নিয়ো	বরুণদ্বীপ
● ইরান	আর্যান, পরশুদেশ
● মেক্সিকো	ময়দেশ।

ভালো কথা

থার্মোকল আর প্লাস্টিক নয়

সেদিন এক ভারী মজা হয়েছে। বাবার অফিসের এক কলিগ-কাকুর মেয়ের জন্মদিনে বাবার সঙ্গে আমি ও ভাই গিয়েছিলাম। কেক কাটা ও মোমবাতি নেভানোর পর সবার সঙ্গে আমরা খেতে বসলাম। কেক কাটা ও মোমবাতি নেভানো দেখে আমি মনে মনে খুবই রেগে ছিলাম কিন্তু বাবা ইশারায় কিছু বলতে নিষেধ করলেন। খাবার টেবিলে দেখি থার্মোকলের প্লেট আর প্লাস্টিকের গেলাস। মনটা আবার বিরক্তিতে ভরে গেল। তখনই আমাদের পাশে আর পিছনের টেবিলের লোকেরা চিৎকার করে বলে উঠল প্লাস্টিক আর থার্মোকল চলবে না। আমিও চিৎকার করে উঠলাম। বাবা আমার ওপর রেগে গেলেন। কিন্তু তখনই কলিগ-কাকু এসে ক্যাটারিঙের লোকদের বললেন কলাপাতা দেওয়া শালপাতার কথা ছিল, আপনারা এ কী করেছেন? দশ মিনিট পরে শালপাতা এল। এই ভুলের জন্য কলিগ-কাকু ক্ষমা চেয়ে নিলেন। আসার সময় বাবা সবাইকে বললেন থার্মোকল আর প্লাস্টিকের সঙ্গে কেউ আপোশ করবেন না। আমার সেদিন খুব আনন্দ হয়েছিল।

শ্রেয়সী চৌধুরী, অষ্টম শ্রেণী, ধূপগুড়ি মিলপাড়া, জলপাইগুড়ি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

অনাবৃষ্টি

তুহিন গোস্বামী, নবম শ্রেণী, তনতন,পুরুলিয়া।

বর্ষাকালে নেইকো বৃষ্টি
চলছে একী অনাসৃষ্টি।
জমিগুলো খালি পড়ে
কৃষকের হতাশা বাড়ে।

শ্রাবণ শেষ ভাদ্র এল
চাষের সময় কেটে গেল।
অন্নদাতার অন্ন নেই
কার পাপেই এমন হলো?

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ৪।।

খেলার দুনিয়ার টুকরো কোলাজ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

দশবছরের দুঃসাহসিক স্পর্ধা : দশ বছরের বালিকার দুঃসাহসিক স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত বিশ্ববাসী। শীলা স্নেইটার যুক্তরাষ্ট্রের ছোট্ট শহর কলোরাডোর বাসিন্দা। অথচ তার স্বপ্ন দেখার চোখ বিশাল। সেই স্বপ্নকে সাকার করতে দিনরাত, মাসের পর মাস ছোটো-বড়ো নানা পাহাড়ে অভিযান চালিয়ে গেছে ট্রেনিং করার মাধ্যমে। তারপর এল সেই বহু প্রতিক্ষিত দিনটি। গত মাসের বারো তারিখে ছোট্ট মেয়েটি সবাইকে চমকে দিয়ে উঠে পড়ল ক্যাপটেন পর্বতশৃঙ্গে। রকি পর্বতের অত্যন্ত দুর্গম ও কঠিন এই শৃঙ্গ আরোহণ। তার বাবাও সে দেশের অতি অভিজ্ঞ ক্লাইম্বার। বাবা-ই তার গাইড ও ট্রেনার। পর্বতশীর্ষে বসে শীলা আনন্দের সঙ্গে পিজ্জা খেয়েছে ও হোয়াটসঅ্যাপে ছবি পাঠিয়েছে বন্ধু-বান্ধবদের। গ্রানাইট মনোলিথিক খোদিত ক্যালিফোর্নিয়ার এই পর্বতগাত্র যুক্তরাষ্ট্রের ভুবনবিদিত পর্বতারোহীদের কাছে পর্বতাভিযানের 'স্টেপিং-স্টোন', ভবিষ্যতে হিমালয় ও অন্যান্য সুউচ্চ পর্বত শিখর জয়ের সাপেক্ষে। শীলা ও তার পরিবার স্বপ্ন দেখছে ভবিষ্যতে মাউন্ট এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, নন্দাঘুন্টি, লোৎসের মতো বিশ্বস্বীকৃত পর্বতশিখর অভিযান সফলভাবে করার।

অবসরে ফার্নান্ডো টোরেস : সব ধরনের সকার টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ালেন স্প্যানিশ সুপারস্টার ফার্নান্ডো টোরেস। এক অসাধারণ, বর্ণময় কেরিয়ারে ইতি টেনে মন দিয়ে সংসার ধর্ম পালন করবেন দুরন্ত এই স্ট্রাইকার। ১৮ বছর ধরে দাপিয়ে ইউরোপে ক্লাব ফুটবল খেলেছেন। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, লিভারপুল, চেলসির হয়ে তার ধ্রুপদী অথচ কার্যকরী ফুটবলে মোহিত হয়ে ছিলেন কোটি কোটি সমর্থক। স্পেনের জাতীয় দলের হয়ে জিতেছেন ইউরো ও বিশ্বকাপ। স্পেনের স্বর্ণযুগের অন্যতম চালিকাশক্তি বা নিউক্লিয়াস হিসেবে জাতীয় দলকে অনেক গৌরবময় জয় উপহার দিয়েছেন। ২০১০ দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে টোরেস-জাভিদভিয়া-ইনিয়েস্তার ত্রিফলা আক্রমণে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছিল বিশ্বের হেভিওয়েট দলগুলির ডিফেন্স। দেশের হয়ে ৮৬টি ম্যাচে ৪৮ গোল করেছেন। আর ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে তিন ক্লাবের হয়ে ২৪০টি গোল করেছেন টোরেস।

অ্যাসলে বার্টি শীর্ষস্থানে : অস্ট্রেলিয়ার টেনিস তারকা অ্যাসলে বার্টি বিশ্ব মহিলা টেনিস র‍্যাংকিংয়ে সিমোনা হালেপকে সরিয়ে একনম্বরে উঠে এলেন। ফরাসি ওপেন জয়ী বার্টি গত মাসে অনুষ্ঠিত উইমবলডন টুর্নামেন্টে জয়ী রোমানিয়ার সিমোনা হালেপ ও সেরেনা উইলিয়ামসের মতো মেগাতারকাদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন। একটু ভারী চেহারা হলেও বার্টি কিন্তু অল-কোর্ট প্লেয়ার। সার্ভিস, ভলি, গ্রাউন্ড স্ট্রোক সব ধরনের অস্ত্রই মজুত তার র‍্যাকেটে। সেটা ফরাসি ওপেনে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে বাঘা বাঘা সব প্রতিপক্ষ। ক্যারোলিন ওজনিয়াকির মতো তারকা মনে করেন একটু দেরিতে সাফল্য পেলেও আগামী ৫-৭ বছর ট্যুর সার্কিটে রাজ করার ক্ষমতা আছে বার্টির। আর অস্ট্রেলিয়ার টেনিস ঐতিহ্য গোটা দুনিয়ার কাছে সম্ভ্রমের বস্তু। সেই ঐতিহ্য রক্ষা করার মস্ত দায় রয়েছে বার্টির। শেষ করে যেখানে সেদেশের পুরুষ তারকা নিক কিরখিয়স এই মুহূর্তে বিশ্ব টেনিসে সবচেয়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড় হয়েও খুব একটা সাফল্য পান না দুর্বিনীত আচরণের জন্য। তাই সাম্প্রতিককালে একমাত্র অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে গ্রান্ডস্লাম জয়ী অ্যাসলে বার্টিকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছেন টেনিস পাগল অজিরা।

অভিনব বিন্দ্রাকে গুরুদায়িত্ব : বিশ্ববন্দিত এয়ার রাইফেল শুটার অভিনব বিন্দ্রাকে অন্য এক টার্গেট ইভেন্টে গুরুদায়িত্ব পালন করতে দেখা যাবে। আন্তজার্তিক তিরন্দাজি সংস্থা ভারতীয় তিরন্দাজির গোষ্ঠী কোন্দল মেটাতে অভিনব বিন্দ্রাকে অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করেছে। বিন্দ্রা দুই বিবদমান গোষ্ঠীকে এক টেবিলে বসিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে দেবেন যাবতীয় সমস্যার এমনটাই আশা করেন আন্তর্জাতিক সংস্থা। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতীয় তিরন্দাজরা মোটামুটি চলনসই সাফল্য পেয়ে আসছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। তাই তাঁরা যাতে বিভ্রান্ত না হয়ে পড়েন, অনুশীলন ও টুর্নামেন্টে যাতে বিরূপ প্রভাব না পড়ে তার জন্য যথেষ্ট চিন্তিত আন্তর্জাতিক তিরন্দাজি সংস্থা। বিন্দ্রার বিশাল ক্যারিশমা ও বিচক্ষণতার ওপর আস্থা আছে তাঁদের। তাই তাদের এই অভিনব সিদ্ধান্ত, যা অভিনবের মুকুটে নতুন পালক।

বাস্কেটবল থেকে গলফে : গ্যারি উডল্যান্ড মার্কিন মুলুকে হইচই ফেলে দিয়েছেন। ছিলেন অ্যামেচার গলফার আর সেদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় ইভেন্ট এনবিএ বাস্কেটবলে উসবানের নিয়মিত খেলোয়াড়। সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে কয়েক বছর আগে পেশাদার গলফে নাম নথিভুক্ত করেন। কানসাস সিটি গলফ ক্লাবের নথিভুক্ত খেলোয়াড় হিসেবে গত কয়েক বছরে টুকটাক সাফল্য পেয়েছেন। কিন্তু অতি সম্প্রতি ইউএস ওপেন গলফ জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন দেশবাসীকে। যে দেশে গলফ ও তার খেলোয়াড়রা অন্য গ্রহের মর্যাদা পায় সেখানে এমন একটি বড়ো মাপের টুর্নামেন্ট ক্যালিফোর্নিয়ার পেবেল বিচ গলফ লিঙ্ক কোর্সে তার মিডাস টাচ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে জাস্টিন রোজ, ডাস্টিন জনসন, লোরি ম্যাকিলরয়ের দুনিয়ার রথী-মহারথী গলফারদের। এই ধরনের সাফল্যের পর আশা করা যায় হোয়াইট হাউস থেকে নির্বাচিত মার্কিন দলে জায়গা পেয়ে যাবেন আসন্ন রাইডার কাপে। ▌

জাতীয় সঙ্গীতকে যিনি ভালোবাসেন না, তিনি কি শিল্পী?

শিতাংশু গুহ

বাংলাদেশিরা ইস্যু ভিত্তিক জাতি। তাঁরা ইস্যু চান। একটা'র পর একটা ইস্যু না হলে তাঁদের চলে না! একটা ইস্যু এলে আগেরটা চাপা পড়ে যায়? মাদ্রাসায় হুজুরদের ধর্ষণ ও বলাৎকার নিয়ে যখন হৈচৈ হচ্ছে, তখন প্রিয়া সাহা এসে সবকিছু ওলট-পালট করে দিলেন। হুজুর উপাখ্যান চাপা পড়ে গেলো। তারপর এলো ডেঙ্গু ইস্যু, প্রিয়া সাহা তাই বাই বাই করছেন। মধ্যখান থেকে নোবেল জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে মন্তব্য করে নতুন ইস্যু সৃষ্টি করলেন। এক সাক্ষাৎকারে গায়ক মইনুল হোসেন নোবেল বলেছেন : ''রবীন্দ্রনাথের লেখা জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' যতটা না দেশকে এক্সপ্লেইন করে তার চেয়ে কয়েক হাজার গুণে এক্সপ্লেইন করে প্রিন্স মাহমুদ স্যারের লেখা 'বাংলাদেশ' এই গানটা''। এই বক্তব্যের মধ্যে হয়তো না বলা অনেক কথা আছে। বাংলাদেশে নোবেলকে কেউ চিনতো না, সারেগামা তাকে চিনিয়েছে। অথচ সাক্ষাৎকারে তাঁর বক্তব্যে সারেগামার প্রতি উষ্মা আছে?

নোবেল ভালো গায়, গলাটা দরাজ। কিন্তু গায়ক? এত তাড়াতাড়ি? একজন মন্তব্য করেছেন, সরকারের উচিত নোবেলকে 'বাড়িগাড়ি' দিয়ে সম্মান করা? পাল্টা অন্য একজন বলেছেন, ক্রিকেট টিমকে আমরা বাড়িগাড়ি সব দিয়েছি, যাতে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে নাকানি-চুবানি খেতে পারে? একজন লেখেন, 'হে বঙ্গজননী, লক্ষ কোটি নোবেল বানিয়েছো, বাঙ্গালি বানাওনি'। আমি গান বুঝি না, কিন্তু গান পছন্দ করি বটে! আচ্ছা নোবেল কি ভালো গায়? অবন্তী ও নোবেলকে সারেগামায় দেখে দেশি হিসাবে ভালোই লেগেছে, কিন্তু এঁরা ফাইনাল পর্যন্ত যাবে তা ভাবিনি। আমি নিয়মিত টিভি দর্শক নই, সবটা দেখিনি, জানিও না, নোবেলকে ফাইনালে দেখে অবাক হয়েছি, কিছুটা খুশিও। অঙ্কিতা'র ধারে কাছে কি নোবেল আছে? নোবেলকে আমার প্রফেশনাল মনে হয়নি, বরং অ্যামেচার মনে হয়েছে।

নোবেল আমেরিকায় আসছেন। শুনলাম, ফোবানা এবং পূজা সমিতিতে গান গাইবেন। পরে জানলাম, জাতীয় সংগীত নিয়ে তাঁর মন্তব্যের পর পূজা সমিতি'র ওপর চাপ পড়ছে। পূজা সমিতি নিউইয়র্কে প্রথম সংগঠন যারা বাংলাদেশ থেকে শিল্পী আনার রেওয়াজ চালু করে, তাদের ওপর চাপ থাকাটা স্বাভাবিক। শেষমেষ তাঁরা নোবেলকে বাদ দিয়েছেন জেনে ভালো লেগেছে। তাঁদের অগ্রিম দেয়া টাকা মার গেছে। ফোবানা'র কথা জানি না, কারণ অনেকগুলো ফোবানা'র প্রায় সব ক'টি এন্টি আওয়ামী লিগ বা বঙ্গবন্ধু বিরোধী। নোবেল কোনো ফোবানায় গান গাইলে তাঁরা নতুন করে আবার সেই কথা প্রমাণ করবেন। না গাইলে তাদের আগাম ধন্যবাদ।

মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী তাজুল ইমাম নোবেলের ওপর বেজায় ক্ষেপেছেন। তিনি লিখেছেন, 'শ্রীকান্ত আচার্যবাবু, আপনারা আমাদের আবাল পোলাডারে গায়ক বানানোর নামে রাম ছাগল বানাইয়া দিলেন। অহন সে জাতীয় সঙ্গীত ম্যারামত করতে চায়'। তিনি আরো বলেছেন, 'বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত জামাতিদের খুবই অপছন্দ। এরা বহুবার প্রস্তাব দিয়েছে বদলে ফেলার জন্য। জিয়াউর রহমানকে আলি আহসান মুজাহিদ এবং নিজামী মন্ত্রী থাকা কালে প্রস্তাব পাঠিয়ে ছিল কিন্তু জিয়ার সাহসে কুলায়নি'। ক্ষেপেছেন আরো অনেকে, যা স্বাভাবিক। আমাদের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় সংগীত, বঙ্গবন্ধু নিয়ে কারো কোনো বিরূপ মন্তব্য অসহ্য। অথচ নোবেল ঠিক সেই জায়গায় আঘাতটা হানলেন।

নোবেলকে টেনে তোলার জন্যে অনেকে মোনালী ঠাকুর ও শান্তনু মৈত্রকে গালি দিচ্ছেন, যা তাদের প্রাপ্য। নোবেল একধারার গায়ক। বাংলাদেশে কোনো টিভিতে সুবিধে করতে না পারলেও কলকাতায় গিয়ে নাম করেছেন। নাটক বা সিনেমায় আমাদের শিল্পীরা কলকাতায় ভালো করছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, একদা হঠাৎ তাদের ভেতরের রূপটা বেরিয়ে পড়ে। নায়ক ফেরদৌস ঠিক তাই করেছেন। নোবেল করলেন। এতে কি কলকাতায় আমাদের কদর কমবে না? দেশে বড়ো শিল্পী হবার সুযোগ তেমন নেই, ভারতে গিয়ে শিল্পী হবার সুযোগটাও আমরা নষ্ট করবো? ধর্ম ব্যবসায়ীরা শিল্প জগতে সফল তেমন দৃষ্টান্ত কিন্তু নেই? কীর্তন বা নাদ যারা গায় তারা শিল্পী বটে, কিন্তু তাদের শ্রোতারা ভিন্ন। সর্বজনীন শিল্পীকে ব্যক্তি ও পার্থিব, অপার্থিব জগৎ থেকে নিজেকে কিছুটা ওপরে তুলে নিতে হয়? নোবেল গোড়াতেই সেই ভুলটা করে ফেললেন। নিজের জাতীয় সঙ্গীতকে যিনি ভালোবাসেন না, সেই শিল্পীর কী প্রয়োজন? গীতিকার ও সুরকার প্রিন্স মাহমুদ বলে দিয়েছেন, 'জাতীয় সঙ্গীত আমাদের অস্তিত্বের নাম'। তাকে ধন্যবাদ। আসলে আহাম্মকরা রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু বা নজরুলকে মুসলমান ভাবে। এরা যে ধর্মীয় গণ্ডির ঊর্ধ্বে এই বোধ নোবেল নামীয় উজবুকদের নেই! রবীন্দ্রনাথ হিন্দু, তাই জাতীয় সংগীত বদলাতে হবে? প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতা হিন্দু পানিনি, ওটা বাদ দিতে হবে! কোরানের বঙ্গানুবাদ করেছেন গিরিশচন্দ্র, ওটা বাদ যাবে? দিনক্ষণ, অর্থাৎ রবি, সোম, মঙ্গল-এগুলো তো হিন্দু পুরাণ থেকে নেওয়া, ওগুলো বাদ। আরে ব্যাটা, সূর্য তো হিন্দুদের দেবতা, ওটাও বাদ দিবি নাকি? সারেগামার ক'জনা অতি উৎসাহী বিচারক আমাদের একজন নব্য রাজাকারকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়েছেন, এখন তিনি লেডি গাগা ও শ্রেয়া ঘোষাল ছাড়া আর কারো সঙ্গে ডুয়েট গাইবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন, এমনকী মোনালি ঠাকুরের সঙ্গেও না? এখানে কি কিছুটা ধর্মান্ধতার গন্ধ আছে? এজন্যেই কি লোকে বলে, 'কাঙালকে শাকের খেত দেখাতে নেই'? ■

তৃণমূলের হাত থেকে বাঙ্গলাকে বাঁচানো এখন প্রধান কর্তব্য

রাজ্য রাজনীতি

নন্দদুলাল চৌধুরী

ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করলে মানুষ কেবল নিজের বিনাশই ডেকে আনতে পারে। এরাজ্যের বাঙ্গালি হিন্দু আজ সেই অপরাধে বিনাশের দোরগোড়ায় উপস্থিত। নিজেদের শেষ আশ্রয়স্থল পশ্চিমবঙ্গকেও তারা হারাতে বসেছে। একজন মুখোপাধ্যায় (শ্যামাপ্রসাদ) প্রাণান্ত চেষ্টায় অখণ্ড বঙ্গের যে অংশটা তাদের জন্য ১৯৪৭-এ আদায় করতে পেরেছিলেন, একজন বন্দোপাধ্যায় (মমতা) আজ সেটাকে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের অবাধ চারণ ভূমি বানাতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। তাঁর হিংস্র NRC (জাতীয় নাগরিকপঞ্জী) বিরোধিতার আর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা হতে পারে না। বিপদটা ঠিকমতো বুঝে এখনই যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে না পারলে আগামী দু' এক দশকের মধ্যে বাঙ্গালি হিন্দুকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাকি ভারতের রাজ্যে রাজ্যে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরতে হবে—ঠিক কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মতো দশা হবে তাদের।

যেসব তথাকথিত উদারনৈতিক, প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী-সাহিত্যিক অনবরত 'রাজনীতিতে ধর্ম কেন', প্রশ্ন তুলে মড়াকান্না কেঁদে চলেছেন, তাঁরা (ক) ভারত ভাগের তথা বাঙ্গলা বিভাগের ভিত্তিটাকেই অস্বীকার করেছেন, এবং (খ) দুরপনেয় মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে তুষ্ট ও পুষ্ট করে দেশের মধ্যে অগণিত ছোটো ছোটো পাকিস্তান বানিয়ে ফেলছেন। এ ব্যাপারে এই মুহূর্তে অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছেন জ্ঞান-জর্জর পশ্চিমবঙ্গের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

(ক) **ভারত-ভাগের তথা বাঙ্গলাবিভাগের ভিত্তি**— জাতীয়তাবাদের তিনটি মুখ্য উপাদান হলো ভাষা, জাতি (নৃতাত্ত্বিক অর্থে) ও ধর্মের ঐক্য (unity of language, ethnicity/race and religion)। এগুলির মধ্যে কেবল ধর্মের ভিন্নতার কারণে ভারতের মুসলমানরা ১৯৪৭ সালে তুমুল আন্দোলন ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে ভারত ভেঙে শুধু মুসলমানাদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি ("a separate homeland for Mulsims alone") হিসেবে পাকিস্তান নামে একটি পৃথক বাসভূমি আদায় করে নেয়। সাথে সাথে স্বাধীন ভারতে তাদের অস্তিত্বের যৌক্তিক ভিত্তিও (raison d'etre) কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। সংখ্যালঘুদরদি রাজনৈতিক দলগুলি এবং বিশ্বপ্রেমিক বাহাদুর বুদ্ধিজীবীরা এই নিদারুণ সত্যটি সুবিধামতো ভুলে থাকেন এবং সবাইকে ভুলিয়ে দিতে চান। মুসলমানরা ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের জনসংখ্যার ২৩%; আর সাধের পাকিস্তানে তাদের জন্য ভারতভূমির প্রায় ২৩% জায়গা দিতে হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভারতের বস্তুত পৃথিবীর কোনো দেশের রাজনীতি থেকেই ধর্মকে মুছে ফেলা যায় না। অন্যদিকে, জাতীয় স্বার্থে প্রগতিশীল আইন কানুন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের ভেটো ক্ষমতা দেওয়ারও কোনো যুক্তি নেই। কেননা মনের সুখে ইসলামি জীবন-চর্যার জন্য তারা তো সাধের পাকিস্তান আগেই বুঝে নিয়েছেন।

মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক সৃষ্টির পাপ—এই ধ্বংসাত্মক ধারণাটি নির্মাণের ক্ষেত্রে আদি পাপী হ'লেন জওহরলাল নেহেরু ও তাঁর কংগ্রেস; সহযোগিতায় সি পি আই অর্থাৎ কমিউনিস্টরা। নেহেরুর নিম্নোক্ত অপকর্মগুলি ইসলামি বিচ্ছিন্নতাবোধকে পুষ্ট করে জাতীয় সংহতির স্থায়ী ক্ষতি ক'রে গেছে—

(ক) মুসলমানদের ধর্মীয় স্পর্শকাতরতার অজুহাতে সংবিধান-প্রতিশ্রুত অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন থেকে বিরত থাকা। (খ) সংবিধানের ৩৭০ ধারা সন্নিবিষ্ট করে জম্মু-কাশ্মীরকে Special status দেওয়া এবং আর্টিক্‌ল্‌ ৩৫-এ-র মাধ্যমে কাশ্মীরি মুসলমানদের 'অতি-নাগরিক' বানিয়ে ফেলা, কার্যত চিরস্থায়ী নতুন জামাই করে রাখা। বাস্তবিকই কাশ্মীর সমস্যা দেশবাসীর প্রতি নেহরুজির প্রীতি উপহার। সুখের বিষয়, ৫-৮-১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে এই দুষ্ট ধারা দু'টির বিলুপ্তি ঘটেছে।

(গ) ১৯৬০-এর দশকের শুরুতেই বাধ্যতামূলক পরিবার পরিকল্পনা চালু না করে মুসলমানাদের বেপরোয়া সংখ্যাবৃদ্ধির সুযোগ অটুট রাখা।

পরবর্তীকালে আরও অনেক রাজনৈতিক দল নেহরুজির পথ ধরে জাতীয় স্বার্থের তোয়াক্কা না করে স্রেফ ভোটের লোভে মুসলমান তোষণের অশুভ প্রতিযোগিতায় নগ্নভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সাম্প্রদায়িক দল কোনটি এবং কীভাবে ঃ যিনি মানুষের খণ্ড পরিচয় অর্থাৎ জাতিগত পরিচয় (নৃতাত্ত্বিক অর্থে—যেমন বাঙ্গালি, বিহারি, ওড়িয়া, তামিল, রাজপুত, নাগা, মারাঠী, পঞ্জাবি প্রভৃতি), ধর্মীয় পরিচয় (যেমন—হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি), ভাষাগত পরিচয় (যেমন—বাঙ্গালি, ওড়িয়া, অসমিয়া, তামিল, কন্নড়, হিন্দিভাষী প্রভৃতি), আঞ্চলিক পরিচয় (যেমন—অসাম, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড, তামিলনাড়ু প্রভৃতি অঞ্চলে ভূমিপুত্রদের জন্য অসংগত অগ্রাধিকার বা privilege-এর দাবি), অথবা অন্য কোনো পরিচয়কে তার সামগ্রিক পরিচয় অর্থাৎ মানবিক বা জাতীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন, এমনকী বিরুদ্ধে দাঁড় করান, তিনিই সাম্প্রদায়িক। আর যিনি প্রতিটি ভারতীয়ের সামগ্রিক মানবিক পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে তাকে অভিন্ন আইনের কাঠামোর মধ্যে এনে পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তিনি অসাম্প্রদায়িক।

এই সংজ্ঞা মেনে নিতে কারও কোনো আপত্তি থাকতে পারে না এবং এই মানদণ্ডে

ভারতের একমাত্র অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হলো বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টি। কারণ, একমাত্র এই দলই অবিচলভাবে দাবি করে যে, প্রতিটি ভারতীয় তার খণ্ড পরিচয়ের গৌরব বজায় রেখেও দেশের সামগ্রিক স্বার্থের কথা ভেবে জাতীয় প্রশ্নে তার জাতীয় অর্থাৎ ভারতীয় পরিচয়েই ভোট দেবেন। পক্ষান্তরে, অন্যান্য জাতীয় বা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল, এমনকী উত্তরাধিকার-সূত্রে শাসন-ক্ষমতার দাবিদার কংগ্রেসও জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশবাসীর কোনো না কোনো খণ্ড পরিচয়কে উস্কে দিয়ে নির্বাচনে বাজিমাত করতে চায়। মুসলমানদের তো এরা স্বতন্ত্র বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমানুষ হিসেবেই গণ্য করে না, কেবল ধর্মীয় সত্তা-সর্বস্ব একটা ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে দেখে। গির্জা বা মসজিদ যখন দলবিশেষকে ভোট দিতে বা না দিতে ফরমান জারি ক'রে, তখন সেটাই হয় সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

ভরসার কথা এটাই যে, জনগণ এদের উস্কানিতে সাময়িকভাগে প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত হ'লেও শেষ পর্যপ্ত দেশের তথা জাতির স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়। এটা মোটেই আকস্মিক ব্যাপার নয় যে, স্বাধীনতার দীর্ঘ ৭২ বছর পরেও (ক) উন্নয়নের স্বার্থে দুর্নীতি-মুক্ত সুশাসন ও (খ) দৃঢ় জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনে (যেটা স্বাধীনতার প্রথম দশকেই মিটে যাওয়া উচিত ছিল।) দেশের মানুষ ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি-র নরেন্দ্র মোদীকেই বিপুলতর সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়ী করেছে। নিছক ক্ষমতালোভীদের খিচুড়ি সরকারের হাতে পড়লে দেশ বিপন্ন হবে, আখেরে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সেটা বুঝতে জনগণ ভুল করেনি।

১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে বামফ্রন্ট তথা সি পি এম-এর অপশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যখন একটা পরিত্রাণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তখন মমতা ব্যানার্জি এলেন তাঁর ধমক-চমক-ধাপ্পার রাজনীতি নিয়ে। এবং ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো রাজ্যবাসী তাকেই পরিত্রাতা ভেবে সমর্থন করলো। অথবা বলা যায়, বহুতল বাড়িতে আগুন লাগলে মানুষ যেমন দিশেহারা হয়ে রেলিং টপ্‌কে নীচে ঝাঁপ দেয়, তেমনিভাবে ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমূলকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষমতায় বসালো। এটা যে এক মরণ-ঝাঁপ, তা বুঝতে অবশ্য রাজ্যবাসীর মোটেই দেরি হলো না। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা হয়ে উঠলেন চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ধত ও স্বৈরাচারী। এটা বুঝেও বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির অনুপস্থিতির কারণে ২০১৬-র নির্বাচনে টিএমসি-র জবরদস্তির কাছে মানুষ অসহায় আত্মসমর্পণ করলো। দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসেই মমতা ব্যানার্জির স্বেচ্ছাচারিতা লাগামছাড়া হয়ে গেল। কেন্দ্রের নেহরু-গান্ধী পরিবারের আদলে তিনি রাজ্যে ব্যানার্জি ডাইনাস্টি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন, ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জিকে দলের শীর্ষে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করলেন। মানুষ বুঝে গেল যে, আন্দোলনকারী হিসেবে মমতা যতটা সফল, প্রশাসক হিসেবে ঠিক ততটাই ব্যর্থ এবং বিপজ্জনক।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা ব্যানার্জির কাজ মাত্রেই অকাজ। (১) তৃণমূল সরকার শুরু থেকেই উৎসব-মহোৎসবে মেতে উঠল—সারা রাজ্যের ক্লাবগুলিকে লক্ষ লক্ষ টাকা বিলিয়ে দেওয়া হলো; ছলে-ছুতোয় যখন তখন রকমারি উৎসবের—যাত্রা উৎসব, মাটি উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠান হলো। এর সবটাই অনুৎপাদনশীল অপব্যয়। অন্যদিকে, অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে একাধিক বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলন করেও শিল্পের দেখা মিললো না। মমতার উন্নয়নকাণ্ড স্রেফ বিউটিশিয়ানের কারিগরি। রাস্তায় ত্রিফলা বাতি লাগানো, আর নানা জায়গায় কিছু পার্ক ও পুকুর-পাড় সাজিয়ে তোলা।

(২) পার্কস্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ডকে মুখ্যমন্ত্রী 'সাজানো ঘটনা' বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন; আর কামদুনির ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অত্যাচারিত পক্ষকে তিনি সরকারি ও দলীয় ক্ষমতার জাঁতাকলে পিষে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন।

(৩) ভবানীপুরের এক ক্লাবের কিছু সদস্য মারামারি করে গ্রেপ্তার হলে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং রাতের বেলায় থানায় গিয়ে পুলিশকে ধমকে-চম্‌কে তাদের ছাড়িয়ে নেন।

(৪) স্রেফ একটা কার্টুন সোশ্যাল মিডিয়ায় ফরোয়ার্ড করার জন্য তার দল ও সরকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রকে নিগ্রহের চূড়ান্ত করে।

(৫) সভাস্থলে সারের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তোলার অপরাধে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ছত্রধর মাহাতোকে 'মাওবাদী' আখ্যা দিয়ে গ্রেপ্তার করান এবং জেল খাটান।

(৬) মমতা এ রাজ্যে ইমামভাতা চালু করেন, নানা স্থানে সংখ্যালঘু ভবন নির্মাণ করেন, মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর কল্যাণের জন্য গাদা গুচ্ছের প্রকল্প চালু করেন, সর্বোপরি, হিন্দু OBC-কে বঞ্চিত করে মুসলমানদের গায়ের জোরে OBC বানিয়ে শিক্ষা ও চাকুরিক্ষেত্রে তাদের জন্য অন্যায়ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

বস্তুত, আলাদা করে মুসলমানদের কল্যাণ সাধনের ধারণাটাই অযৌক্তিক এবং অন্যায়। দেশের রাস্তা-ঘাট ভালো হলে, কৃষিতে ফলন বাড়লে, বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নতি হলে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি হলে হিন্দুর মতো মুসলমানও তাতে সমানভাবে উপকৃত হয়। রাষ্ট্রের কাজ শুধু এটা নিশ্চিত করা যে, ধর্মবিশ্বাসের কারণে কোনো ভারতীয়কে যেন পড়াশুনা, চাকুরি, ব্যবসা বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্যের শিকার হতে না হয়। তাই, মুসলমানদের বৈষয়িক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে সাচার কমিটি বানানোর কাজটি ছিল দুরভিসন্ধিমূলক। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানদের মধ্যে একটা ভিত্তিহীন বঞ্চনাবোধ জাগিয়ে তাদের সম্মিলিত ভোট কাছে টানা। কংগ্রেস এই অপকর্মটি করেছে চুপিসারে, আর মমতা ব্যানার্জি করছেন রণহুংকার দিয়ে।

NRC বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর ঘোষিত উদ্দেশ্য হলো ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের পর প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে যেসব মানুষ অবৈধভাবে ভারতে এসে বসবাস করছেন, তাদের চিহ্নিত করা এবং তাদের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। আর, নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিলের লক্ষ্য হলো দেশভাগের সময়ে বা তার পরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান-সহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলি থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যেসব মানুষ প্রধানত হিন্দু তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে চলে এসেছেন, তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দান। সেখানে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কোনো cut-off date হিসাবে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। দেশভাগের অসহায় বলি এই মানুষগুলিকে নাগরিকত্ব দিয়ে মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত

করা স্বাধীন ভারতের ঐতিহাসিক দায়। বিল দুটি পরস্পরের পরিপূরক এবং সর্বতোভাবে ন্যায়সম্মত। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদেরও (যারা স্বাধীনতার সময় থেকেই এরাজ্যের বাসিন্দা) এতে স্বার্থ আছে। তারাও নিশ্চয়ই চাইবেন না যে, বাংলাদেশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা এসে তাদের জীবিকায় ভাগ বসাক। দু'টি উদ্যোগকেই অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাধুবাদ জানানো সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই কর্তব্য। অথচ কী আশ্চর্য! মমতা ব্যানার্জি NRC-র বিরোধিতায় ক্ষেপে উঠেছেন, আর নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিলও তিনি সমর্থন করছেন না। তার অভিসন্ধি কিন্তু সরল এবং সোজা–তিনি চাইছেন, দু'টি বিল থেকেই ধর্মীয় কারণে নিপীড়নের প্রশ্নটি উঠে যাক এবং বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা কাতারে কাতারে এসে তার মুসলমান ভোট ব্যাঙ্ক বাড়িয়ে তুলুক, তাতে রাজ্য তথা দেশের যত সর্বনাশই হোক না কেন।

জীবজগতে কোনো প্রজাতির বিপন্নতার কারণ দ্বিবিধ—(১) প্রাকৃতিক ও (২) জৈবিক। কেউ কেউ বলেন, অতীতে কোনো এক সময়ে অতিকায় উল্কাপাতের ফলে ডাইনোসরদের বিলুপ্তি হয়ে থাকতে পারে। এটি প্রকৃতিক কারণ। আবার, বনাঞ্চল ধ্বংস করে মনুষ্য-বসতি সম্প্রসারণের ফলেই নাকি রয়াল বেঙ্গল টাইগার ক্রমশ পিছু হটে সুন্দরবন অঞ্চলে ঘাঁটি গাড়তে বাধ্য হয়েছে। এটি প্রাকৃতিক ও জৈবিক কারণের সম্মিলিত ফল।

বাঙ্গালি হিন্দুর বিপন্নতার গতিপথটি এরকম ঃ ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে তারা যে যখন পেরেছে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্মের ফলেও হিন্দুর অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। কেননা, বাংলাদেশ সর্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানেরই বাঙ্গালি সংস্করণ মাত্র। বস্তুত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গালি হিন্দু পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের হাতে যতটা অত্যাচারিত হয়েছে, তার চাইতে শতগুণ শরণার্থীর স্রোত পশ্চিমবঙ্গে অব্যাহত রয়েছে। তার সাথে ভয়ংকর এক নতুন উপসর্গ যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ নামক মনুষ্য প্রজনন খামারে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মুসলমানদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ জীবিকার সন্ধানে বা জেহাদি জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে অবাধে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়ছে, এরাজ্যের জন-বিন্যাসকে পাল্টে দিয়ে বাঙ্গালি হিন্দুর জীবন-জীবিকা বিপন্ন করে তুলছে।

পূর্ববঙ্গ থেকে বিপুল সংখ্যক হিন্দু শরণার্থীর আগমন সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের অনুপাত আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। এর একমাত্র ব্যাখ্যা হলো—-মুসলমান জনসংখ্যার দ্রুততর বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ থেকে অগণিত মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর আগমন। এখনও সতর্ক না হলে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালি হিন্দুর বাঁচার জায়গা থাকবে কি?

'জয় শ্রীরাম' বনাম 'জয় বাংলা'—ভারত বনাম পশ্চিমবঙ্গ ঃ যাত্রাপথে কোথাও 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনলেই মমতা ব্যানার্জি গাড়ি থেকে নেমে তেড়ে যাচ্ছেন স্লোগান দাতাদের শায়েস্তা করতে। বশংবদ পুলিশকে দিয়ে তিনি সেখানে যাকে তাকে শুধু 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেবার অপরাধে মিথ্যে অভিযোগে গ্রেপ্তার করাচ্ছেন। অথচ ১৯৯১–৯২ সালে ঘোর বাম জমানায়ও এরাজ্যে 'জয় শ্রীরাম' কোনো সরকারি দমন-পীড়নের সম্মুখীন হয়নি। 'জয় শ্রীরাম'-এর স্থলে 'জয় ভারত', 'জয় হিন্দ', 'জয় দুর্গা', 'জয় কালী' ইত্যাদি বলে মমতা ব্যানার্জি শেষ পর্যন্ত 'জয় বাংলা'য় পৌঁছে গেছেন। আর কে না জানে, 'জয় বাংলা' হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের যুদ্ধনাদ। এ কোন্ সর্বনাশা ইঙ্গিত? তবে কি, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের বোকা বানিয়ে তিনি কোনো আঞ্চলিক স্বাধীনতা যুদ্ধে ঠেলে দিতে চাইছেন?

আবার দেখুন, রাজ্যে ক্ষমতালাভের পর থেকেই মমতা ব্যানার্জি যুক্তরাষ্ট্রীয়তার দোহাই দিয়ে ধারাবাহিকভাবে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছেন, পদে পদে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করছেন। সারদা কাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এক বড় কর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সিবিআই-এর একটা টিম তার বাড়িতে গেলে রাজ্য পুলিশ উল্টে তাদেরই আটক ও হেনস্তা করে। সংবিধানের কাশ্মীর সংক্রান্ত 370 ও 35(A) ধারার বিলুপ্তি ঘোষণা করে রাষ্ট্রপতির আদেশটি অনুমোদনের জন্য গত ৫-৮-১৯ তারিখে রাজ্যসভায় পেশ করা হলে সেটার বিরোধিতা করে তৃণমূলের সাংসদরা ওয়াক-আউট করেন। হ্যামলেটের পাগলামির মতোই তাঁর আপাতখ্যাপাটে কথাবার্তা ও কাজকর্মের মধ্যে একটা গূঢ় অভিসন্ধি সতত ক্রিয়াশীল। মুসলিম আগ্রসন ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে উস্কে দিয়ে নিজের মুসলমান ভোটব্যাঙ্ককে মজবুত করে তিনি ব্যানার্জি বংশের পত্তন করতে চাইছেন এবং সেটা বাঙ্গালি হিন্দুর সর্বনাশের মূল্যে।

EVM-এ কারচুপির প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের কাছে সব রাজনৈতিক দল যখন উপর্যুপরি হার মেনেছে, তখনও TMC-র সাংসদরা লজ্জার মাথা খেয়ে গত ২৬-৬-১৯ তারিখে পার্লামেন্ট চত্বরে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধরনায় বসলেন এবং লোক হাসালেন। নিজের রাজনৈতিক পুঁজি একেবারেই শূন্য হয়ে গেছে বুঝে মমতা ব্যানার্জি এখন ব্যালটকেই শেষ ভরসা বলে আঁকড়ে ধরছেন। কারণ, পুলিশের সহায়তায় জবরদস্তি করে প্রতি মিনিটে একশো জাল ভোট ব্যালটবাক্সে ভরা সম্ভব। হায়রে দুর্মতি।

গত জুন মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশ্য দিবালোকে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ট্রাক ভর্তি করে এসে শাজাহান শেখের নেতৃত্বে সন্দেশখালির ভাঙ্গিপাড়ায় হামলা

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

- যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৯-এর আগে শেষ হচ্ছে তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে পরবর্তী নবীকরণের টাকা ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বস্তিকা কার্যালয়ে জমা করুন। যাতে আপনার পূজা সংখ্যাটি পাঠানো সম্ভব হয়।
- স্বস্তিকার এজেন্টদের বিশেষ অনুরোধ করা হচ্ছে যে, আগস্ট '১৯ মাসের বিল সমেত সমস্ত বকেয়া টাকা ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বস্তিকা কার্যালয়ে পাঠান, যাতে আপনার প্রয়োজনীয় পূজা সংখ্যা সময়মতো পাঠানো যায়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

চালায়। তাতে বিজেপির সমর্থক প্রদীপ মণ্ডল ও সুকান্ত মণ্ডল খুন হয়। দিদির অনুগত পুলিশ খুনীদের শাস্তিবিধানের জন্য যথারীতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়নি।

এই ঘটনার দু'চার দিন পরে NRS হাসপাতালে মহম্মদ সইদ নামে এক মুমূর্ষু হৃদরোগীর মৃত্যু হ'লে ট্যাংরা কলোনির বিবির বাগান এলাকা থেকে ট্রাক ভর্তি করে সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা এসে হাসপাতালে চড়াও হয় এবং কর্তব্যরত ডাক্তারদের মারধোর করে। একজন ডাক্তারের মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত লাগে। এর প্রতিবাদে NRS-এর ডাক্তাররা কর্মস্থলে নিরাপত্তার দাবিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘটে নামেন। এতবড় ঘটনার পর দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের নির্দেশ এবং চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অশ্বাস দানের বদলে মুখ্যমন্ত্রী কেবল ডাক্তারদের কাজে যোগদানের আহ্বান জানিয়েই দায়িত্ব শেষ করেন। ক্রমশ দেশের সর্বত্র বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তাররা NRS-এর ধর্মঘটি ডাক্তারদের সমর্থনে কর্মবিরতি শুরু করেন; ফলে গোটা দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মদগর্বী মুখ্যমন্ত্রীর সুমতি হলো---তিনি ডাক্তারদের সাথে আলোচনায় বসলেন এবং দীর্ঘ সাতটি দিন পরে ১৮-৬-১৯ তারিখে ডাক্তারদের ধর্মঘট উঠে গেল, রাজ্যের তথা দেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আপন ভালো নাকি পাগলেও বোঝে। তবে বাঙ্গালি হিন্দু বোঝে কি-না, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে সেটাই দেখার ছিল। এই পরীক্ষায় সে কোনোমতে উতরে গেছে। ৪২-এর মধ্যে ১৮টি আসন থেকে TMC-কে দূর করতে পেরেছে। আসল পরীক্ষা এখনও বাকি। 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে মমতার TMC-কে সমূলে বিনাশ করতে না পারলে বাঙ্গালি হিন্দু নামক বিপন্ন প্রজাতিটি অবধারিত বিলুপ্তির গ্রাসে পড়বে।

মমতা ব্যানার্জিকে নিয়ে মুশকিল এই যে, তিনি মেরেও জিতবেন, আবার কেঁদেও জিতবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের মিটিং, মিছিলে তাঁর ভাইয়েরা অনবরত হামলা করবে, এমনকী বাড়ি-বাড়ি গিয়ে প্রচারেও বাধা দেবে, আর উনি কাঁদুনি গাইবেন শান্ত পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি অশান্তি ছড়াচ্ছে, মারামারি-খুনোখুনি শুরু করছে। এই ধোঁকাবাজি মানুষ ধরে ফেলেছে। মমতা ব্যানার্জির পশ্চিমবঙ্গে বিগত পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে যত মানুষ খুন-জখম হয়েছে, তার 10% ও অন্য কোনো রাজ্যে হয়নি। আবার, ভিন্ন দলের, বিশেষ করে বিজেপি-র, রাজনৈতিক প্রচারকে উনি সর্বদা বাংলার সংস্কৃতির পরিপন্থী বলে দুষছেন; অথচ, গালিগালাজপূর্ণ ভাষণ ও আক্রমণাত্মক অঙ্গভঙ্গির দৌলতে উনি নিজেই হয়ে উঠেছেন মূর্তিমতী অপসংস্কৃতি।

দুর্নীতি, তোলাবাজি ও দমন-পীড়নের ক্ষেত্রে সিপিএম যেখানে শেষ করেছিল, টিএমসি সেখান থেকেই শুরু করেছে, এবং এগুলিকে জনজীবনের সর্বত্র সম্প্রসারিত করছে। তবে সিপিএম-এর অত্যাচার ছিল পরিকল্পিত ও সুশৃংখল, অন্যদিকে টিএমসি-র অত্যাচার নিয়ন্ত্রণহীন ও বিশৃঙ্খল। দেশে এ মুহূর্তে দুজন সফল ধাপ্পাবাজ দু'টি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত---একজন দিল্লিতে, অন্যজন পশ্চিমবঙ্গে; একজন sophisticated (মার্জিত), অন্যজন valgar (মেঠো)। রাজ্য শাসন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দু'জনেই সমান বেপরোয়া, অপব্যয়ী, ধ্বংসাত্মক এবং ব্যর্থ।

নিজের অপকর্মের বিষে টি এম সি তথা মমতা ব্যানার্জি আজ যখন জর্জরিত ও মুমূর্ষু, তখন ঝাঁড়ফুকে প্রাণ বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টায় প্রশান্ত কিশোর-রূপী ওঝাকে ডেকে আনা হয়েছে। তার প্রথম দাওয়াই 'কাট-মানি ফেরানোর ডাক' বুমেরাং হয়েছে; আর দ্বিতীয় দাওয়াই 'দিদিকে বলো' অভিযান মাটি ছেড়ে উঠতেই পারেনি। দেয়ালের লিখন অতি স্পষ্ট—তৃণমূলের সমূলে বিনাশ। কিন্তু তার আগে বিপদের কথা এটাই যে, বিরোধী রাজনীতি দমনে মমতা ব্যানার্জি পুলিশকে যেভাবে যতখানি কাজে লাগাচ্ছেন, তাতে পুলিশ ক্রমশ জনগণের প্রতিপক্ষ বা শত্রু হয়ে উঠছে। এভাবে চলতে থাকলে রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক রক্তক্ষয়ের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। মমতা ব্যানার্জির বেপরোয়া এবং ধ্বংসাত্মক রাজনীতি থেকে রাজ্যটাকে বাঁচানোই এখন কর্তব্য। বাঙ্গালি হিন্দুকে মনে রাখতে হবে, মমতা ব্যানার্জিকে একটি ভোট দেওয়ার (কিংবা তার বিরুদ্ধে একটি ভোট দিতে না পারার) মানে হলো নিজের জীবিত সন্তানের জন্য আগাম চিতা সাজিয়ে ফেলা।

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন
আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করলেন মোদী

অম্লানকুসুম ঘোষ

সমস্ত জীবনের একটা বড়ো অংশ মানুষ অতিবাহিত করে ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে কিন্তু কিছু কিছু বিরল মুহূর্ত হঠাৎ আসে যখন মানুষ নিজের চোখের সামনে ইতিহাস সৃষ্টি হতে দেখে, সেরকমই এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিরল ঘটনা ঘটতে দেখল দেশবাসী গত ৫ আগস্ট। এদিন দেশের ভাগ্যাকাশে গত সাত দশক ধরে কালো মেঘের মতো জমে থাকা ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি ঘটালেন বর্তমান সরকার।

আজ যখন মুক্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছেন আপামর কাশ্মীরবাসী তখন বড়ো মনে পড়ে যাচ্ছে এই মুক্তির মন্দির সোপানতলে আত্মবলিদান দেওয়া এক মহামানবের কথা। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখার্জির পুত্র ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের যুক্তবঙ্গের সফলতম অর্থমন্ত্রী। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী হিসেবে দেশের শিল্পনীতির নীতিনির্ধারণকারী সেই মহাপুরুষ ৩৭০ ধারার হাত থেকে কাশ্মীরের ও কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। দেশজুড়ে ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে তিনি জনমত তৈরি করেন অবশেষে ৩৭০ ধারা অমান্য করে বিনা পারমিটেই কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। সেখানে তাকে গ্রেপ্তার করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা হয়। তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে অবশেষে চিকিৎসার নামে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কাশ্মীরে তাঁকে খুন হতে হয়। যখন তাঁর মৃতদেহ ফিরে এসেছিল কলকাতায়, বিপুল জনপ্লাবনে ভেসে গিয়েছিল রাজপথ, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রথিতযশা চিকিৎসক ড. বিধানচন্দ্র রায় তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্ট দেখে বলেছিলেন ভুল চিকিৎসা হয়েছে। কিন্তু ড. বিধানচন্দ্র রায়, ড. মেঘনাদ সাহা, শ্যামাপ্রসাদ জননী-আশুতোষ ঘরণী যোগমায়া দেবী এবং কোটি কোটি দেশবাসীর আকুল আবেদন সত্ত্বেও নেহরু শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর তদন্ত কমিটি গঠন করলেন না। ষড়যন্ত্রের অংশীদার কারা তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল দেশবাসীর কাছে সেইদিনই। দেশবাসী গর্জে উঠেছিল শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর তদন্তের দাবিতে। তৎকালীন ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী কলকাতায় পদযাত্রা হয়েছিল, তাতে পা মিলিয়েছিলেন স্বয়ং ড. বিধানচন্দ্র রায়, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের চূড়ান্ত আত্মত্যাগের কোনো বিচার পাওয়া যায়নি। বরং সেই দুঃখের স্মৃতিকে ভুলিয়ে দিয়েছিল কমিউনিস্টরা গণআন্দোলনের নামে দু'পয়সা ভাড়া বাড়ার বাহানায় প্রচুর ট্রাম বাস পড়িয়ে।

কাশ্মীরের যাওয়ার পথে শ্যামাপ্রসাদ (১১ মে, ১৯৫৩)

কী আত্মঘাতী বিষ সঞ্চিত ছিল এই ৩৭০ ধারার বুকে যা ভারতমাতার এমন মহান সুসন্তানকে এভাবে কেড়ে নিয়েছিল?

৩৭০ ধারার বলে ভারতের কোনো আইন কানুন এমনকী ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বা আদেশ জম্মু-কাশ্মীরে প্রযোজ্য হতো না।

জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দাদের দুটি নাগরিকত্ব ছিল।

জম্মু-কাশ্মীরের রাষ্ট্রীয় পতাকা আলাদা ছিল।

জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভার কার্যকাল ৬ বছরের ছিল।

এমনকী জম্মু-কাশ্মীরের ভিতরে ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকার অপমান করা অপরাধ ছিল না।

জম্মু-কাশ্মীরের কোনো মহিলা ভারতের অন্য কোনো রাজ্যের কোনো পুরুষকে বিবাহ করলে ওই মহিলার জম্মু-কাশ্মীরের নাগরিকত্ব সমাপ্ত হয়ে যেতে।

এছাড়াও ৩৭০ ধারার বলে পাকিস্তানের কোনো নাগরিক জম্মু-কাশ্মীরে থাকলে তিনিও ভারতের নাগরিকত্ব পেয়ে যেতেন এবং পাকিস্তানের কোনো নাগরিক জম্মু-কাশ্মীর কোনো মহিলাকে বিয়ে করলে ভারতের নাগরিকত্ব পেয়ে যেতেন।

জম্মু-কাশ্মীরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আইন ছিল না। ৩৭০ ধারার বলে কাশ্মীরে আর.টি.আই., সি.এ.জি., আর.টি.ই. ও প্রযোজ্য ছিল না।

কাশ্মীরে থাকা হিন্দু এবং শিখদেরও ১৬ শতাংশ সংরক্ষণ ছিল না।

কাশ্মীরে মহিলাদের ওপর শরিয়ত আইন চালু ছিল।

জম্মু-কাশ্মীরে ভারতের অন্য কোনো রাজ্যের বাসিন্দা জমি কিনতে না পারলেও জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দা ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে জমি কিনতে পারতেন।

জম্মু-কাশ্মীরের জন্য ছিল আলাদা সংবিধান।

এতদূর পড়ে মনে হতে পারে এই ভয়ংকর ধারা জম্মু-কাশ্মীরের জন্য চালু হয়েছিল কেন?

সেকথার উত্তর জানতে হলে ওলটাতে হবে অধুনা বিস্মৃত ইতিহাসের কিছু ধুলিমলিন পাতা।

১৯৪৭ সালে যখন দেশ দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় স্বাধীন হয় তখন গোটা দেশজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য প্রণীত হয়েছিল একটি নিয়ম। নিয়মটি হলো, যে দেশীয় রাজ্যের চতুর্পার্শ্বে ভারত আছে সেই দেশ ভারতে যোগদান করবে, যে দেশীয় রাজ্যের চতুর্পার্শ্বে পাকিস্তান আছে সেই দেশ পাকিস্তানে যোগদান করবে, যে দেশীয় রাজ্যের চতুর্পার্শ্বে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই আছে সেই দেশ তার শাসনকর্তার ইচ্ছানুযায়ী ভারতে অথবা পাকিস্তানে যোগদান করবে। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য এই নিয়ম মেনে ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগদান করলেও গোলমাল বাঁধলো তিনটে রাজ্যকে নিয়ে— জুনাগড়, হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর। স্বাধীনতার পর জুনাগড়ের নবাব ঘোষণা করলেন তিনি পাকিস্তানে যোগদান করবেন, হায়দরাবাদের নিজাম আর কাশ্মীরের রাজা হরি সিংহ ঘোষণা করলেন যে তারা স্বাধীন থাকবেন। জুনাগড় ও হায়দরাবাদ এই দুই দেশীয় রাজ্যের চতুর্পার্শ্বে ভারত ছিল তাই নিয়ম অনুযায়ী এই দুই দেশীয় রাজ্য ভারতে যোগদান করতে বাধ্য ছিল। ভারত সরকার তাই আপন সৈন্যবাহিনীর দ্বারা এই দেশদুটিকে ভারতভুক্ত করলো কিন্তু কাশ্মীরের চতুর্পার্শ্বে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই ছিল তাই কাশ্মীরের মহারাজা ভারত-পাকিস্তান কোনও দেশে যোগ না দিয়ে পৃথক থাকার কথা ঘোষণা করলেও ভারত অথবা পাকিস্তান কোনও সরকারই আপন সৈন্যবাহিনীর দ্বারা কাশ্মীরকে নিজ রাষ্ট্রভুক্ত করতে পারলো না। নিয়ম অনুযায়ী সরাসরি কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে অপারগ হওয়ায় ভারত কাশ্মীরের স্বাধীনভাবে পৃথক থাকা মেনে নিল কিন্তু আগ্রাসী পাকিস্তানের তা ধাতে সইলো না। ভারতের মতো তারাও নিয়ম অনুযায়ী সরাসরি কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে অপারগ ছিল কিন্তু পাহাড়ি উপজাতীয় বিদ্রোহীদের ছদ্মবেশে তারা কাশ্মীরে সৈন্য পাঠালো। মহারাজের সেনা প্রতিরোধে অগ্রসর হলো কিন্তু মহারাজের সেনার একটা বড়ো অংশ ধর্মের দিক থেকে ছিল মুসলমান। তারা মহারাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে যোগ দিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে। মহারাজের হিন্দু সেনাবাহিনী বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ করলো পাকিস্তানি হানাদারদের। কিন্তু অল্প সংখ্যক কাশ্মীরি সেনা হানাদারদের বিশাল বাহিনীর সামনে ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল। খুন, লুণ্ঠন, গণহত্যা করতে করতে মৃত্যুপাগল পাকিস্তানি সেনা ধেয়ে এল শ্রীনগরের দিকে। পথে মহুয়ায় তৎকালীন কাশ্মীরের একমাত্র তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তারা ধ্বংস করে দিল। সম্পূর্ণ শ্রীনগর ডুবে গেল অন্ধকারে। কেরোসিনের আলোয় কাশ্মীরের মহারাজা নিঃশর্তে ভারতভুক্তির চুক্তিতে সই করলেন। মহারাজা সই করার সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর ভারতের অংশ হয়ে গেল। নিজের দেশ রক্ষা করার জন্য কাশ্মীরে যাবার নৈতিক অধিকারপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনা তখন কাশ্মীরে গিয়ে মুখোমুখি হলো পাকিস্তানি হানাদারদের। রণদক্ষ ভারতীয় বাহিনীর সামনে পিছু হাঁটতে শুরু করলো পাকিস্তানি সেনা। ধীরে ধীরে কাশ্মীরের একের পর এক অংশ আসতে লাগলো ভারতীয় বাহিনীর দখলে। সম্পূর্ণ কাশ্মীর ভারতের আয়ত্তে আসা তখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। এই সময় এক অগাধ বুদ্ধির খেলা খেললেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল। তিনি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেন, ৩৭০ ধারা জারি করলেন এবং বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য হাজির হলেন হলেন রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে। বিষয়টি কি রাষ্ট্রপুঞ্জে নিয়ে যাওয়া এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল? আন্তর্জাতিক আইন কী বলছে? উত্তরে বলা যায়, যে মুহূর্ত থেকে কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল সেই মুহূর্ত থেকে আন্তর্জাতিক আইন বা রাষ্ট্রপুঞ্জ ভারতের অভ্যন্তরীণ কাশ্মীরের ব্যাপারে কোনও কথা বলতে পারে না, তাই ভারতের অংশ কাশ্মীর থেকে বিদেশী হানাদারদের বিতাড়িত করার সম্পূর্ণ অধিকার তখন ভারত সরকারের ছিল, সেই অধিকারের সদ্ব্যবহার না করে খাল কেটে রাষ্ট্রপুঞ্জের কুমির এনেছিলেন নেহরু আর আশা করেছিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জ সমস্যার সমাধান করবে। অপেক্ষার সেই শুরু। আর মাত্র কয়েকদিনের যুদ্ধে যে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যেত রাষ্ট্রপুঞ্জে যাবার পর সত্তর বছরেও সেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি।

এই সত্তর বছর ধরে কাশ্মীরে বেড়েছে পাকিস্তানের প্রভাব আর উগ্রপন্থা, অপরপক্ষে ক্রমাগত কোণঠাসা হয়েছেন কাশ্মীরের আদি বাসিন্দা সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দু পণ্ডিতরা। লক্ষ লক্ষ হিন্দু পণ্ডিত খুন হয়েছেন, হিন্দু মহিলারা ধর্ষিতা হয়েছেন জেহাদি মুসলমান

আগ্রাসানকারীদের হাতে। দিনের পর দিন কাশ্মীরে স্লোগান উঠেছে কাশ্মীর মে রহে না হ্যায় তো আল্লাহো আকবর বোলনা হ্যায়। যে কাশ্মীর উপত্যকার স্বর্ণালী ইতিহাস নিজেদের মেধা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দিয়ে ৫০০০ বছর ধরে গড়ে তুলেছিলেন নিজেদের প্রাণাধিক প্রিয় সেই কাশ্মীর উপত্যকা ছেড়ে, নিজেদের পূর্বপুরুষের জমি, বাড়ি, বাস্তুভিটে ফেলে রেখে তাঁরা বাধ্য হলেন শরণার্থীর জীবনযাপন করতে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে জম্মু ও কাশ্মীরের কী এমন সম্পদ আছে যা অধিকার করার জন্য পাকিস্তানের এত চেষ্টা? রাজ্যটির মোট আয়তন মাত্র ১০১৩৮০ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ১৫১৭০ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে কাশ্মীর উপত্যকা (মোট এলাকার ১৫ শতাংশ), ২৬৩৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে জম্মু উপত্যকা (মোট এলাকার ২৬ শতাংশ), ৫৯৮৩০ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে লাদাখ উপত্যকা (মোট এলাকার ৫৯ শতাংশ)।

জম্মু ও কাশ্মীরের মোট জনসংখ্যাও খুব কম, মাত্র ১ কোটি ২৫ লক্ষ, কাশ্মীর উপত্যকার মোট জনসংখ্যা ৬৯ লাখ (মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ), জম্মু উপত্যকার মোট জনসংখ্যা ৫৩ লাখ (মোট জনসংখ্যার ৪২.৫ শতাংশ), লাদাখ উপত্যকার মোট জনসংখ্যা ৩ লাখ (মোট জনসংখ্যার ২.৫ শতাংশ)। কৃষিজ বা খনিজ সম্পদেও প্রদেশটি সেরকম সমৃদ্ধ নয়।

ত সত্ত্বেও কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তানের এত আকর্ষণ থাকার বেশ কিছু কারণ আছে। প্রথমত, কাশ্মীরের প্রকৃতি যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশেষ আশীর্বাদপ্রাপ্ত, তুলনারহিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অধিকারী কাশ্মীর যেন আক্ষরিক অর্থেই ভূস্বর্গ। স্মরণাতীতকাল থেকেই পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে এসেছে কাশ্মীর। কাশ্মীরের প্রতি পর্যটকদের এই আকর্ষণকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পে কাশ্মীরকে অনেক উন্নত করে তোলা যেত এবং প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যেত। সেই বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ কত দেখা যাক, ১৯৬০ সালে সুইজারল্যান্ডের পর্যটন খাতে আয় ছিল মাত্র ৯৫.২ লক্ষ ডলার বা ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা, ২০১৪ সালে সুইজারল্যান্ডের পর্যটন খাতে আয় ছিল ৭০৯১৮ কোটি ডলার বা ৪৪২০৩১৮ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। ১৯৬০ সালে কাশ্মীরের পর্যটন খাতে আয় ছিল ৩৭ কোটি ডলার বা ১৭৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, ২০১৪ সালে কাশ্মীরের পর্যটন খাতে আয় ছিল মাত্র ২৫০০ কোটি ডলার বা ১৫৫৮২৫ কোটি টাকা। উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেল ১৯৬০ সালে কাশ্মীরের পর্যটন খাতে আয় সুইজারল্যান্ডের পর্যটন খাতে আয়ের ৩৯ গুণ ছিল কিন্তু ২০১৪ সালে সুইজারল্যান্ডের পর্যটন খাতে আয় কাশ্মীরের পর্যটন খাতে আয়ের ২৫ গুণ। ১৯৬০ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত এই ৫৪ বছরে সুইজারল্যান্ডের আয় বৃদ্ধি হয়েছে ৭৪৫০০ গুণ একই সময়কালে কাশ্মীরের আয় বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৭০ গুণ। এই সময়কালে কাশ্মীরের আয়বৃদ্ধি যদি সুইজারল্যান্ডের আয় বৃদ্ধির সমহারে হতো তাহলে ২০১৪ সালে কাশ্মীরের পর্যটন খাতে আয় হতো ২৭৫৬২৭০ কোটি ডলার বা ১৭১৭৯৮১১০ কোটি টাকা যা গোটা ভারতের মোট জিডিপি-র ৮ গুণ (ভারতের জিডিপি বছরে কোটি ডলার বা ১৭১৭৯৮১১০ কোটি টাকা)। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর ও সুইজারল্যান্ডের আয় বৃদ্ধির এই বিপরীতমুখী অবস্থানের একটাই কারণ সুইজারল্যান্ড পর্যটন শিল্পে যত উন্নতি করতে পেরেছে কাশ্মীর তা করতে পারেনি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে কাশ্মীরের তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকা সুইজারল্যান্ড পর্যটন শিল্পে এত বেশি উন্নতি করলো অথচ কাশ্মীর গহন তিমিরে তলিয়ে গেল এর একটাই কারণ কাশ্মীরে উগ্রপন্থার জন্য পর্যটকদের স্বাভাবিক ভীতি। এই ভীতি সৃষ্টি করেছে পাকিস্তান, তাদের লক্ষ্য একটাই উগ্রপন্থার ক্রমবর্ধমান চাপে অতিষ্ঠ হয়ে ভারত যদি কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেয় তাহলে পর্যটন শিল্পে কাশ্মীরের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করবে। ৩৭০ ধারা ও ৩৫এ'র বলে বলীয়ান পাকিস্তান না থাকলে শুধু কাশ্মীরের পর্যটন শিল্পের সাহায্যেই ভারত আজ বছরে উপরোক্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারতো যা ভারতের অর্থনীতিকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারতো এবং পর্যটন শিল্পে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানও হতে পারতো। ৩৭০ ধারা ও ৩৫এ'র কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত কাশ্মীর আজ উগ্রপন্থার ভূতকে দূরীভূত করে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে নিজ অর্থনীতির উন্নতি সাধন করবে।

আজ থেকে ৬৬ বছর আগে যেদিন প্রতিবাদহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী সত্যিই নীরবে নিভৃতে কেঁদেছিল সেদিন ষড়যন্ত্রকারীরা কেউ বোঝেনি যে শ্যামাপ্রসাদ এমন একটি প্রতিষ্ঠানিক বীজ বপন করে গিয়েছিলেন যেটি প্রতিষ্ঠাতার স্বপ্নপূরণে কোনোদিন পিছু হটবে না এবং যেদিনই সুযোগ পাবে সেইদিন তাঁর স্বপ্নকে সাকার করে ছাড়বে। আজ কাশ্মীর আর বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত রাজ্য নয়। ড. মুখার্জির স্বপ্নের এক বিধান এক নিশান এক প্রধান আজ বাস্তবায়িত, এর থেকে বড়ো গুরুদক্ষিণা আর কীই বা হতে পারতো। ■

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৬

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী ত্যাগীবরানন্দ, জয়ন্ত কুশারী

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - চিহ্নায়ন ● রন্তিদেব সেনগুপ্ত - অভ্রকণা, অশ্রুকণাগুলি
প্রবাল চক্রবর্তী - মহিষাসুর নির্ণাশী ● জিষ্ণু বসু - লিপা

বড়ো গল্প

সন্দীপ চক্রবর্তী - ধুলো

গল্প

এষা দে, রমানাথ রায়, মালিনী চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ সিংহ,
গোপাল চক্রবর্তী

ভ্রমণ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়— বোহেমিয়া-বাভারিয়ার ভূখণ্ডে

প্রবন্ধ

বিজয় আঢ্য, অচিন্ত্য বিশ্বাস, রঙ্গা হরি, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, অর্ণব নাগ, জয়ন্ত ঘোষাল,
সুজিত রায়, সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম মুখোপাধ্যায়,
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ বসু।

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা